বিশ্বামিত্র-পুত্র

ঋষি মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রকাশক

শ্রী জ্ঞানেশ্বর দে

চন্দননগর।

প্রথম সংস্করণ

শ্রাবণ, ১৩৩২

মূল্য পাঁচ সিকা]

নিবেদন

বেদের এই যে ব্যাখ্যা আমি দিয়াছি, তাহা আমার নিজস্ব নয়। ভাষ্যকার অথবা ভাষ্যকারের ভাষ্যকার মাত্র। বেদের যৌগিক ব্যা —অন্যথা, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা (psychological interpretation) অরবিন্দ; তাঁহার কথা আমি যতদূর বুঝিয়াছি সেই মত বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য অরবিন্দ যে আমার দেওয়া সব অর্থই অনুমোদন করিবেন, এমন আশা করিতে পারি না; তবে খুঁটিনাটিতে পার্থক্য দাঁড়াইলেও, মোটের উপর—বিশেষতঃ মূল তত্ত্বগুলির সম্বন্ধে— মতদ্বৈধ তাঁহার সহিত আমার হইবে না, এই ভরসা আমি কম দিতে পারি। যাঁহারা অরবিন্দের নিজের কথা শুনিতে চাহেন তাঁহারা "Arya" পত্রিকা দেখিবেন; তবে এ সংবাদটিও দেওয়া যে "Arya" পত্রিকায় তিনি বেদসূক্তের যে রকম অনুবাদ পরে তাহাতে অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

একটি জ্ঞাতব্য বিষয়—আমি বিশদ ও বিস্তৃত ভাষ্য দেই নাই, চাহি নাই। আমি দিয়াছি কতকগুলি মূলসূত্র বা পথের যাহা ধরিয়া পাঠক নিজের বুদ্ধি ও অনুভূতিকে চালাইতে পারেন নিজে নিজেই বেদার্থ আবিষ্কার করিতে পারেন।

শ্রাবণ, ১৩৩২ — শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

উপক্রমণিকা

'বেদ' জিনিষটি কি? আমরা ত জানি বেদ হইতেছে ভারতের শিক্ষাদীক্ষার উৎস, হিন্দুর ধর্ম্মের বনিয়াদ, আর্য্যজাতির সভ্যতার মূল। বেদ যে মানে না, সে নাস্তিক, অহিন্দু, ম্লেচ্ছ, যবন, অনার্য্য। 'বেদবাহ্য' অর্থ মানুষের বাহির, 'বেদভ্রষ্ট' অর্থ পতিত। হিন্দুর সব শাস্ত্র, তাহার ধর্ম্মের তাহার কর্ম্মের যেখানে যাহা কিছু নির্দ্দেশ আছে, উপনিষৎ দর্শন পুরাণ সকলেরই এক কথা—শ্রুতি কি বলে? শ্রুতি-বিরুদ্ধ যাহা তাহা অসত্য ও অগ্রাহ্য। আমাদের সকল শাস্ত্রই বেদের বৃহৎ টীকা, এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা বিপ্লবপন্থী, নূতন মতবাদ যাঁহারা প্রচার করিতে চাহেন, তাঁহাদেরও সব সময়ে সাহসে কুলায় না বেদের বিরুদ্ধে সোজাসুজি দাঁড়াইতে; তাঁহারা চেষ্টা করেন বেদের মধ্যেই তাঁহাদের অনুকূল মত খুঁজিয়া লইতে অথবা বেদের তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লইতে, আর না হয় বলিতে যে শ্রুতি তাঁহাদের বিশেষ মতামতটি সম্বন্ধে 'হাঁ না' কোন বচন দিতেছে না।

হিন্দুধর্ম্মের মত বৃহৎ উদার ধর্ম্ম যে আর নাই, সে যে এত বিচিত্র, এমন জটিল, তাহার মধ্যে যে এত রকমের বিভিন্ন শিক্ষাদীক্ষার ধর্ম্মাচরণের ধারা আসিয়া মিলিয়াছে—এই রহস্যের গোড়ার তত্ত্ব পাই

বেদের মধ্যে। ঋগ্বেদীয় ঋষি দীর্ঘতমার বাণী যুগের পর যুগ ধরিয়া হিন্দুর, ভারতের প্রাণ অনুপ্রাণিত করিয়া আসিয়াছে—সে বাণী এখনও তেমনি পরিচিত, তেমনি সজীব—একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি। যে গায়ত্রী মন্ত্র আজও আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত অনুস্যূত হইয়া আছে, তাহা একদিন প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল যাহার কণ্ঠে তিনি হইতেছেন বৈদিক মন্ত্রকৃৎ ঋষি বিশ্বামিত্র। আমাদের সামাজিক জীবনের যে প্রধান প্রধান কর্ত্তব্য বা সংস্কার—বিবাহ চূড়াদি দশকর্ম্ম—তাহার অনুষ্ঠানে এই বিংশ শতাব্দীতেও আমরা বৈদিক ঋষির নির্দ্দেশই অনুসরণ করিয়া চলি।

বেদ তাই আমাদের মতে নিত্য সনাতন, শাশ্বত স্বাম্ভু, অবিকল্প অব্যাভিচারী চরম সত্যপুরুষ ব্রহ্মেরই মত। ব্রহ্ম শব্দের মূল অর্থই হইতেছে বাণী অর্থাৎ বেদবাণী। বেদ তাই চিরসত্য,—সৃষ্টির আদিকাল হইতে, পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান। বেদ কেহ তৈয়ার করে নাই, সৃষ্টি করে নাই, করিতে পারে না—ঋষিরাও নহেন। ঋষিরা শুধু দিব্য-শ্রবণে ইহা শুনিয়াছেন, দিব্য-দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং ধরিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া চলিয়াছেন। বেদ তাই 'অপৌরুষেয়'। খাঁটি হিন্দুর ইহাই ধারণা ও বিশ্বাস।

খৃষ্টানদের যেমন 'বাইবেল', মুসলমানদের যেমন 'কোরাণ', বেদ কি সেই ধরণের একখানি গ্রন্থ? কারণ বেদকে আমরা যে চক্ষে দেখি, যে সব বিশেষণে ভূষিত করি, খৃষ্টানেরা তাহাদের 'বাইবেল'কে, মুসলমানেরা তাহাদের 'কোরাণ'কে ত সেই চক্ষেই দেখেন, সেই সব বিশেষণেই ভূষিত করেন। তাই যদি হয়, তবে দাঁড়ায় এই কথা যে বেদকে আমরা যে আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি, বাস্তবিক বেদ তাহার উপযুক্ত

নয়—বেদ সম্বন্ধে আমরা যাহা বলি তাহা অত্যুক্তি মাত্র। কারণ, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ই আপন আপন ধর্ম্মপুস্তককে সর্ব্বের উপরে স্থান দিয়া আসিয়াছে, বিশ্বাস করিয়াছে সেইখানিই একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ ('বাইবেল' শব্দের অর্থ "গ্রন্থখানি"—The book), তাহারই তত্ত্ব চরম সত্য, তাহারই নির্দ্দেশ অটুট শাশ্বত সনাতন—তাহা মানুষের নয়, ভগবানের বাণী। সুতরাং নিরপেক্ষ জ্ঞানের চক্ষে দেখিলে, দেখি নাকি পৃথিবীর বহু মূল ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে একখানি শুধু হইতেছে বেদ? বেদকে হিন্দুরা যে এত প্রকাণ্ড করিয়া তুলিয়াছে তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ নাই কি জাতীয় অভিমান, স্বধর্ম্মের প্রতি অন্ধ অনুরাগ, অস্থিমজ্জাগত একটা প্রাচীন সংস্কার ? সুতরাং নিরপেক্ষ জ্ঞানেরই কষ্টিপাথরে আজ কষিয়া দেখিতে হইবে বেদের মূল্য কি। প্রাচীনকে শুধু মানিয়া চলিলে হইবে না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে সেই মানিয়া চলার যথার্থ হেতুবাদ। অর্থাৎ বেদকে যে অভ্রান্ত নিত্য সত্য, অপৌরুষেয় প্রভৃতি আখ্যা আমরা হিন্দুরা দিয়া থাকি, যথার্থতঃ সে তাহা পাইতে পারে কি না, এই জিজ্ঞাসা আজ তুলিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে বেদের মধ্যে আছে কি, বেদ কি বলিতে চায়, বেদ সাক্ষাৎ অধ্যয়ন করিয়া অলোচনা করিয়া আমরা কি বুঝি, কি শিখি ?

এই জিজ্ঞাসা আজ অনিবার্য্য এবং ইহার প্রয়োজনও আছে যথেষ্ট। এই জিজ্ঞাসা প্রথমে তুলিয়াছেন ইউরোপীয়েরা। ইউরোপে ইহারই নাম Higher Criticism—নব জিজ্ঞাসা বা সমালোচনা শুধু আমাদের নহে, নিজেদের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধেও ইউরোপ বহু আগে এই জিজ্ঞাসা তুলিয়াছেন, এবং সে সম্বন্ধে বাদ বিচার এখনও চলিতেছে।

ইউরোপের মনের ধরণই এই যে কোন জিনিষ সে সহজে ও সহসা মানিয়া লইতে চাহে না, সত্যকে প্রতি পদে পরীক্ষা করিয়া তবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। আবহমানকাল একটা জিনিষ চলিয়া আসিয়াছে বলিয়াই যে সে জিনিষটা প্রামাণ্য, এমন কথা ইউরোপ কখন স্বীকার করে না। লোকমুখে শুনিয়া বস্তুর সত্যতা সে নির্দ্ধারণ করে না; সে বস্তুকে সাক্ষাৎ দেখিতে ধরিতে ছুঁইতে চাহে। এই অভ্যাসটির মূল্য যে কতখানি তাহা বলা বাহুল্য। আমরা অনেক কাল ইহাকে হারাইয়াছি। ইদানীন্তন কালে বস্তুকে ছাড়িয়া আমরা বস্তুর নাম লইয়া বাদ বিচার তর্কাতর্কি করিয়াছি। সুতরাং ইউরোপ হইতে যদি নূতন একটা ধাক্কা আসিয়া আমাদিগকে কিছু সচেতন করিয়া থাকে, তবে সে জন্য ইউরোপের কাছে আমরা ঋণী।

বেদের চর্চ্চা—যে বেদ নাকি আমাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা, আমাদের অন্তরাত্মারই প্রতিষ্ঠা—তাহা আমাদের দেশে এক রকম লোপই পাইয়াছিল। এখন পর্য্যন্তও মূল বেদের সহিত পরিচয় আছে এমন লোক খুবই বিরল—বেদগ্রন্থ চোখেও দেখেন নাই এমন লোকের ত লেখাজোখা নাই। ইউরোপে কিন্তু বাইবেলের ভাগ্য অন্য রকম। নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের খাতিরে বেদের দুই চারিটি মন্ত্রের সহিত সাধারণ লোকের যে পরিচয় ছিল তাহা হইতেছে "বিদ্যা স্থানে ভয়ে বচ" গোছের। সাধারণে জানিত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি। আর পাণ্ডিতেরা জানিতেন দর্শন, উপনিষৎ প্রভৃতি। যে রামমোহন হিন্দুর জীবনে নূতন দৃষ্টি, নূতনশক্তি আনিয়া দিয়াছিলেন তিনিও উপনিষদের ওদিক আর যাইতে পারেন নাই। তা ছাড়া যে কয়েক জন বিশেষজ্ঞের মধ্যে

বেদের পঠনপাঠন আবদ্ধ ছিল, তাঁহাদের আলোচনাদি চলিত মুল বেদকে লইয়া ততখানি নয়, যতখানি বেদের টীকা-টিপ্পনী লইয়া ; নিরুক্ত, পাণিনি, মীমাংসা, সকলের উপরে সায়ণাচার্য্য বেদের বস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল—এই গহন গভীর অরণ্যানী ভেদ করিয়া বেদ শিখরে পৌছিতে কাহারও সাহস হইত না। সাধারণের কাছে, পণ্ডিতের কাছেও বেদ অর্থই ছিল একরকম যাহা অতি দুরূহ, বুদ্ধির অগম্য ! বেদের নাম আমরা শুনিতাম আর দূর হইতে নমস্কার করিতাম। এজন্য দায়ী কে বা কি, সে প্রশ্ন তুলিতেছি না, বলিতেছি অবস্থাটা কি ছিল সেই কথা।

ইউরোপ কিন্তু তাহার দুরন্ত সাহসে ভর করিয়া এই দুর্গম দুর্গ আক্রমণ করিল। আমরা যেমন অত্যধিক ভয় ভক্তি সহকারে, অতি সন্তর্পণে বেদ ধরিতে ছুঁইতে যাই, ইউরোপের সেই রকম করিবার কোন কারণ ছিল না। পরদেশী পরধর্ম্মীর কাছে বেদ একখানা মানুষ প্রণীত প্রাচীন পুস্তক মাত্র। প্রাচীন কালের ভারতবাসীর বা আর্য্য-জাতির মনোভাব ধরণধারণের সহিত পরিচিত হইবার জন্য সে শুধু চাহিয়াছিল ইহার অর্থ উদ্ধার করিতে, কোন রকম শিক্ষাদীক্ষার জন্য ইহার কাছে সে যায় নাই। বেদের চারিদিকে যে একটা পর্দ্দা কুহেলিকা ছিল ইউরোপ তাহা ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ফেলিল, সেখানে আনিয়া দিল দিনের আলো, আধুনিক চিন্তাবৃত্তির প্রখর রৌদ্র। ইউরোপের দুঃসাহসের ফলের কথা আমরা পরে বলিতেছি, কিন্তু তার আসল ফল এই যে ভারতবাসীর মধ্যে একটা সাহস ও প্রেরণা আসিয়াছে বেদ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে, নূতন চোখে বেদকে দেখিতে।

সকল সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া খোলা মনে খোলা চোখে ইউরোপের

মনীষীরা বেদ আলোচনা করিয়া কি দেখিলেন সেখানে? তাঁহারা যাহা আবিষ্কার করিলেন সেটি ভয়ানক একটা আশ্চর্য্য জিনিষ—এত ভয়ানক আশ্চর্য্য যে বেদকে হিন্দুরা মাথায় করিয়া রাখে কেন, অভ্যাস ও গতানুগতিক সংস্কার ছাড়া তাহার আর কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইউরোপ বলিল বেদ হইতেছে মানুষের অতি পুরাতন কীর্ত্তি, মানুষের সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য-রচনার চেষ্টা। ইহা মানবজাতির আদিম কালের গাথা সংগ্রহ। মানুষ যখন অপরিণত, সমাজ যখন সবেমাত্র গড়িয়া উঠিতেছে, তখনকার ভাব চিন্তা কার্য্য-কলাপ আচার-ব্যবহার যাহা সেই সব বিবরণ রহিয়াছে এই বেদে। বেদ হইতেছে 'কৃষকের গান', শিশুর মুখে প্রথম কাকলি। মানুষের যখন আদিম অসংস্কৃত অসভ্য প্রকৃতি, তখন সৃষ্টির যাবতীয় বস্তুকে সে প্রাণবন্ত করিয়া দেখিত, প্রকৃতির লীলাখেলার পশ্চাতে অশরীরী শক্তি—দেবতা দানবের সত্তা অনুভব করিত। ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহারা গান ছড়া আকারে যে সব প্রার্থনা করিয়াছে তাহাই হইতেছে বেদের মন্ত্র। বৃষ্টির জন্য ইন্দ্রকে বরুণকে, রৌদ্রের জন্য সূর্য্যকে আরাধনা করিত। ঝড়ের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া মরুৎকে অনুনয় বিনয় করিত, উষার মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার মঙ্গলগীতি গাহিত। তাহাদের সহজ সরল মন প্রকৃতির কর্ত্তারূপে যে সব দেব দৈত্যের কল্পনা করিয়া লইয়াছিল তাহারা অদ্ভুত শক্তিমান—এই বিশ্বাসে ঐ সব শক্তিধরের কাছে তাহারা প্রণতি জানাইত, চাহিত দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিষ, সাংসারিক উন্নতি এবং মৃত্যুর পরে পারত্রিক মঙ্গল। গোঅশ্বই ছিল তাহাদের জীবনোপায় তাই পুষ্টাঙ্গ গাভী তেজীয়ান অশ্ব চাহিত। পরস্পরের

মধ্যে বিভিন্ন দলে দলে তাহাদের আবার যুদ্ধ বিগ্রহও চলিত (বিশেষতঃ তাহাদের সকলের শত্রু ছিল দস্যুজাতি অর্থাৎ ভারতের প্রাচীন অধিবাসী দ্রাবিড় জাতি, তাহারা নিজেরা ছিল বিদেশ হইতে আগত আর্য্যজাতি), তাই চাহিত অস্ত্রশস্ত্র, শত্রুর পরাজয়, নিজেদের বিজয় আকাঙ্খা করিয়া দেবতার সাহায্য কামনা করিত।

দেবতাদের প্রীতি সম্পাদনের জন্য তাহারা একটী বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিত—সেটী হইতেছে যজ্ঞ। তৃণ ও কাষ্ঠ দিয়া বিশেষ ভঙ্গীতে বেদি সাজাইয়া তাহাতে আগুণ জ্বালাইত, আগুণে ঢালিত ঘৃত, দধি ও সকলে সমবেত হইয়া দেবতার কাছে মদ্য (সোমরস) নিবেদন করিত ও নিজেরা তাহা পান করিত। তখনকার লোকেরা আগুণ জিনিষটি নিশ্চয়ই সবেমাত্র অবিষ্কার করিয়াছিল, ইহার প্রয়োজন, ইহার মূল্য ও মাহাত্ম্য হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছিল। তাহারা বাস করিত যে খুব শীতপ্রধান বরফের দেশে। এই কারণে অগ্নির পূজাই তাহাদের একরকম প্রধান অনুষ্ঠান ছিল, অগ্নিই ছিল তাহাদের প্রধান দেবতা।

ইউরোপীয়দের মতে ইহাই হইল বেদ—অর্থাৎ আদিমকালের আদিম মানুষের ধর্ম্মের ও সমাজের ইতিহাস। কিন্তু দেশীয় মতে অর্থাৎ যে মত প্রচলিত বেদবিৎ পণ্ডিত সমাজে—সেটি কি? এই দেশীয় মতকার হইতেছেন সায়ণাচার্য্য। সায়ণাচার্য্য সমস্ত ঋগ্বেদের ব্যাখা রাখিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সাহায্য না পাইলে ইউরোপীয়েরাও বেদের অপ্রচলিত পুরাতন ভাষা হইতে কিছু অর্থ নিষ্কাষণ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ফলতঃ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বেদের যে ব্যাখ্যা দিয়াছিল তাহা মোটের উপর সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যার উপরেই

প্রতিষ্ঠিত। তবে সায়ণাচার্য্য বৈদিক ঋষিদিগকে শিশু বা আদিম প্রকৃতির মানুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। বেদের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার উপরও তিনি তেমন জোর দেন নাই। তিনি বেদকে দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন যাজ্ঞিক ক্রিয়াকাণ্ডের দিক হইতে। যজ্ঞ জিনিষটি কি এবং কি ভাবে করা হইত তাহার খুঁটিনাটি বিবরণ তিনি বেদ হইতে উদ্ধার করিতে চাহিয়াছেন। যজ্ঞ হইতেছে ধর্ম্ম-সাধনার একটা বিশেষ প্রক্রিয়া, আত্মার উন্নতির জন্য ঐহিক পারত্রিক কল্যাণের জন্য ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দেবতারা স্বর্গ বলিয়া একটা লোকে থাকেন—তাঁহাদের শক্তি প্রাকৃতিক শক্তির পিছনে। এক এক প্রাকৃতিক শক্তিকে অধিষ্ঠান করিয়া আছেন এক এক দেবতা। সকল দেবতা মিলিয়া বিশ্বদেবতা, বিশ্বদেবতা এক দেবতারই বিভিন্ন মূর্ত্তি। দেবতাদের শক্তিতেই মানুষের শক্তি, মানুষও দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়া দেবতাদের তৃপ্তি দেয়। দেবতারা মানুষের নিবেদিত প্রণতি পাইয়া ও সোমরস পান করিয়া পুষ্ট ও তুষ্ট হন আর মানুষও তাহাতে লাভ করে ইহলোকে সমৃদ্ধি ও পরলোকে সদ্গতি।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ও দেশীয় পণ্ডিতেরা বেদের যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন তাহা মিলাইয়া মিলাইয়া এক করা যাইতে পারে। আমরা আধুনিক শিক্ষিতেরা যাহারা বেদচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছি, আমরা সচরাচর সেই পথই অনুসরণ করিয়াছি। বেদের প্রাকৃতিক ও যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা মিলাইয়া প্রাচীন ভারতের অসভ্য ঠিক নয়, তবে আদিম সমাজের শিক্ষাদীক্ষার চিত্রখানি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করি। *

* নমুনা স্বরূপ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত "বেদবাণী" গ্রন্থ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই যদি বেদের প্রকৃতস্বরূপ হইল, তবে প্রথম প্রশ্ন উঠে, হিন্দু-ধর্ম্মের ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষার আর্য্য প্রতিভার বনিয়াদ হইল ইহা কোন্ গুণে? আদিম বা শিশু মানবের ছড়াগান যাহা, বড় জোর, যাহা হইয়াছে অতীত যুগের কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান তন্ত্রমন্ত্র—"তুকতাক ঝাড় ফুঁক" —তাহার প্রভাব এ রকম হইল কি প্রকারে যে আজ পর্য্যন্তও তাহা অব্যাহত, আজ পর্য্যন্তও তাহা আমাদের মনকে জীবনকে ঘিরিয়া ছাইয়া আছে? বাইবেল হউক কোরাণ হউক তাহার প্রভাব যে বর্ত্তমান সভ্য শিক্ষিত সমাজেও অটুট থাকিবে তাহার হেতু বরং বুঝিতে পারি। কারণ, বাইবেলে কোরাণে অন্যান্য জিনিষ যাহা থাকুক না কেন, তাহার মূলে আছে এমন আদর্শ, এমন সত্য, এমন বিধান যাহা চিরকালের, যাহা অনুসরণ করিয়া সকল মানুষই আজ পর্য্যন্তও উপকৃত হইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্যেরা অথবা আমাদের গোঁড়া পণ্ডিতেরা বেদের যে অর্থ করেন তাহাতে মনুষ্যত্ব সাধনার, ধর্ম্মজীবন পরিচালনার পক্ষে সকল দেশের সকল কালের উপযুক্ত এমন কোন সত্য ও তথ্যই ত সেখানে দেখিতে পাই না। এটা কি তবে, পূর্ব্বে আমরা যে বলিয়াছি, সেই গতানুগতিক জড় অভ্যাস মাত্র? প্রাচীনকালের সংস্কারটির জের শুধু আমরা আজ পর্য্যন্ত টানিয়া চলিয়াছি? আধুনিক যুগে আমরা বেদের যুগ হইতে অনেক দূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছি জ্ঞানে উপলব্ধিতে ভাবে আদর্শে—রক্তেরই টানের মত একটা অন্ধটানের বশে (atavism) আমরা আমাদের আদি পিতৃপুরুষদের সাথে মিল রাখিয়া চলিতে চাহিতেছি? বেদ মূল-প্রতিষ্ঠা—শুধু এই হিসাবে যে সকল মূলই হইতেছে অতি স্থূল বাহ্যিক, সহজ, সাধারণ? উপরে ফলফুলে সুশোভিত বৃক্ষের যে মূল তাহারই মত সে মাটির নীচে অন্তরালে প্রোথিত ও সেখানে প্রোথিত

থাকাই তাহার পক্ষে উপযুক্ত, সেটি হইতেছে দাঁড়াইয়া ভর করিয়া উঠিবার আশ্রয় মাত্র, ইহার বেশী তাহার সার্থকতা নাই ? তবে এ দৃশ্য দেখি কেন ভারতের সাধনায় যুগে যুগে দেশে দেশে বেদের রহিয়াছে এমন জাগ্রত প্রভাব—বেদকে যে সকলে মানিয়া আসিয়াছে সেটা শুধু কথায় ভক্তি দেখাইবার জন্য নয় (by courtesy), কিন্তু পদে পদে কার্য্যতঃই সকলে 'শ্রুতি'র নির্দ্দেশ চাহিয়াছে ?

এইখানেই দ্বিতীয় প্রশ্নটি উঠে। শ্রুতি অর্থে পাশ্চাত্যেরা বা আধুনিকেরা হয়ত বলিবেন বেদ নয় কিন্তু বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ। আচ্ছা এই উপনিষদ কি বলিতেছে ? উপনিষদকে আমরা—দেশী বিদেশী আধুনিক যুগের সকলেই খুব উঁচুদরের জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া জানি ও মানি। উপনিষদের চর্চ্চা আমাদের দেশে ছিল ও আছে, বিদেশেও হইয়াছে—বেদের তুলনায় অনেক বেশী। তাহার একটা কারণ এই যে উপনিষদের ভাব ও ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক—ইদানীন্তনকালের মনের চিন্তার ধারা তাহাকে অনেকখানি আপনার বলিয়া ধরিতে ও বুঝিতে পারে। উপনিষদে যাগযজ্ঞ তন্ত্রমন্ত্রের জালজঞ্জাল নাই, উপনিষদ বলিতেছে স্পষ্টভাবে তত্ত্বকথা দার্শনিক তথ্যের কথা। এই জিনিষটা দেখিয়াই পাশ্চাত্যেরা বলিয়া থাকেন যে উপনিষদ হইতেছে বেদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া, এমন কি বিদ্রোহ। বৈদিক যুগের শেষাশেষি আর্য্যহিন্দু তাহার সরল প্রকৃতিবাদ ও যজ্ঞপরায়ণতা ছাড়িয়া দিয়া একটা তত্ত্বজিজ্ঞাসার, শুদ্ধ ঈশ্বর বা পরমাত্মাবাদের দিকে চলিয়াছিল। উপনিষদে এই দিকটাই প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, প্রাচীনকালের আদিমযুগের ধর্ম্মকর্ম্মের প্রভাব হইতে মুক্তি পাইয়া নূতন জ্ঞানী মনীষীরা উন্নততর সমাজে পাইয়াছেন

ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন একটা বিশুদ্ধ বুদ্ধি, দার্শনিক অনুভূতি, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। কিন্তু পাশ্চাত্যের এই যে ঐতিহাসিক গবেষণা, ইহার ভিত্তি কি? উপনিষদে বস্তুতঃ কি দেখিতে পাই? প্রতিপদে দেখি না কি উপনিষদ আপনার সব তত্ত্বানুভূতি বেদের কথার সহিত মিলাইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কোন একটি সিদ্ধান্ত করিয়াই তাহার প্রমাণের জন্য অনুরূপ সিদ্ধান্ত বেদ হইতে হুবহু উদ্ধৃত করিয়াছেন? উপনিষদ যে বেদের কিছু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন বা তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন এমন ইঙ্গিতও ত কোথাও পাই না। উপনিষদ হইতেছে—বেদান্ত, বেদের অন্ত অর্থাৎ পরিপূরক বা পরিণতি। ইতিহাসের ধারায় একটা বিরোধের খেলা (dialectic) থাকিবেই থাকিবে—জর্ম্মণ দার্শনিক হেগেলের (Hegel) পর হইতে এই রকম একটি ধারণা ইউরোপের জন্মিয়া গিয়াছে, একটা সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। নিজের অতীত ইতিহাসে ইউরোপ দেখে যে রোমক জাতির পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইতেছে খ্রীষ্টধর্ম্ম, আবার কাথলিক (Catholic) ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইতেছে 'লুথার' ও প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম; সেই হেতু ভারতের ধর্ম্মের ইতিহাসেও ইউরোপ আবিষ্কার করিতে চাহেন একটা প্রতিবাদমূলক গতিধারা। ভারতের ইতিহাসে এই রকম জিনিষের যে একান্ত অভাবই আছে তাহা আমরা বলিতে চাহি না, কিন্তু বেদ ও উপনিষদের মধ্যেও যে সে সম্বন্ধ থাকিবে তাহার মানে কি? ফলতঃ উপনিষদ সর্ব্বদাই অতি ভক্তিসহকারে অতি সম্ভ্রমে বেদের উল্লেখ করিয়াছে, কঠিন সমস্যা যেখানে সেখানেই বৈদিক ঋষিদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছে—বলিয়াছে, এই কথাই আমাদের পূর্ব্বতন জ্ঞানীদের কাছে শুনিয়াছি—"ইতি শুশ্রূম ধীরাণাং… …;"

আরও কথা আছে। বেদের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত পন্থা যদি স্বয়ং-বিরোধী না হইত, তাঁহাতে যদি কষ্টকল্পনা, গোঁজামিল, অবোধ্যতা, নানাপ্রকার স্বেচ্ছাচার না থাকিত, তবুও না হয় বুঝিতাম। বেদের চলিত অর্থ অনেক জায়গায় বেশ মানান-সই, এ কথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু অনেক জায়গায় শুধু যে মানান-সই নয় তাহা নয়, ঐ অর্থে বেদের অনেক জায়গা প্রলাপোক্তি ছাড়া আর কিছু হয় না। প্রাকৃতিক ব্যাখ্যাই হউক আর যাজ্ঞিক ব্যাখ্যাই হউক, ঐটুকু দিয়াই যখন আমরা বেদের সব বুঝিতে চাই, তখন দেখি বাধ্য হইয়া আমাদিগকে প্রতিপদে পা বদলাইতে হইতেছে, কোন কথার মানে ঠিক রাখা যাইতেছে না, বারে বারে সুবিধামত পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে। 'ঘি' অর্থ কোথাও 'জল' (১-৮৭-২, সায়ণ), 'জল' (অপ্) অর্থ কোথাও 'অন্তরীক্ষ' (১-৩৬-৮) 'অন্তরীক্ষ' অর্থ কোথাও 'পৃথিবী'। এইজন্যই দেখি সায়ণাচার্য্য বা রমেশ দত্ত স্থানে স্থানে কথায় কথায় মানে দিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু সমস্ত বাক্যটা এমন এক কিম্ভূতকিমাকার জিনিষ হইয়াছে যে তাহা পাগলের মুখেও শোভা পায় না—অনেক অনেক যায়গায় এমন হইয়াছে যে তাহা দেখিয়া হাসিব কি কাঁদিব বুঝা ভার—অনেক যায়গায় বুদ্ধিমানের মত চুপ করিয়া গিয়াছেন অথবা সহজেই স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন যে এখানে অর্থ কিছুই বুঝিলাম না। অবশ্য অজুহাত দেওয়া যাইতে পারে যে বেদ এক পুরাতন পুস্তক, তাহার ভাষা এত প্রাচীন যে তাহার অনেক কিছু যদি না বুঝি তবে বিশেষ আসে যায় না, মোটামুটি বুঝিলেই হইল। কিন্তু এই মোটা-মুটিই বুঝিতে যেখানে দেখি এত কারচুপি খেলিতে হয়, সেখানে যে বৃহৎ গলদ একটা কিছু আছে, তাহাই সহজ বুদ্ধিতে বলে।

বেদের মোটামুটি অর্থটা যদি অত সরল সোজাসুজিভাবে চলিত-অর্থটিকেই ব্যক্ত করে তবে ত সকলেই সেই একই অর্থ অনুসরণ করিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা নয়। আধুনিক যুগে আমরা দেখিতেছি বেদের প্রাকৃতিক ও যাজ্ঞিক অর্থ ছাড়া আছে ঐতিহাসিক অর্থ (অবিনাশ চন্দ্র দাশ), ভৌগলিক অর্থ (উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন), জ্যোতিষিক অর্থ (তিলক), বৈজ্ঞানিক অর্থ (পরমশিব আয়ার), এমন কি রাসায়নিক অর্থ (নারায়ণ গৌড়)—আর কত কি! "নানা মুনির নানা মত", এই মহাবাক্যটি বেদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য এমন বোধ হয় আর কিছুতে নয়। বেদের দুই চারিটা স্থানে যে বিশেষ ভাব বা অর্থ যে ব্যাখ্যাকারের মনে তাঁহার আপন প্রকৃতি ও পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ যুক্তিযুক্ত বোধ হইয়াছে তিনি সেইটিকেই একান্ত করিয়া তাহার দ্বারাই সমস্ত বেদরহস্য বুঝিতে চাহিয়াছেন। ফলে একই শ্লোকের যে কত-রকম ব্যাখ্যা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অবশ্য এই সব ব্যাখ্যার কোনটি যে সম্পূর্ণ বেদ এমন কি বেদের যথেষ্ট পরিমাণ অংশ সম্যক সুষ্ঠুরূপে বুঝাইতে পারে, তাহা নয় বেশীর ভাগ ব্যাখ্যাকার সে চেষ্টাও করেন নাই। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় বেদ রহস্যের চাবিকাঠি এখনও পাওয়া যায় নাই—সকলেই অন্ধকারেই হাতড়াইয়া বেড়াইতেছেন।

২

বেদ বুঝিবার পক্ষে তবে প্রকৃষ্ট পন্থা কি? সব পূরাতন রচনা যথার্থতঃ বুঝিবার যে পন্থা, বেদ বুঝিবারও সেই পন্থাই। তাহা কি? প্রথম যতদূর সম্ভব সকল পূর্ব্বসংস্কার বর্জ্জিত হইয়া বেদের মূলের সহিত সাক্ষাৎ পরিচিত হওয়া। টীকাকার ভাষ্যকার বৈয়াকরণিক আলঙ্কারিক সকলে মিলিয়া সকল প্রাচীন পুস্তকেরই চারিদিকে এত জালজঞ্জালের ঘের তুলিয়া দিয়া থাকেন, যে তাহার মধ্যে আমরা শুধু পথ হারাইয়া ঘুরিয়া মরি, ভিতরের মন্দিরে প্রবেশলাভ ত দূরের কথা। তাই দেখি বেদের সহিত আমাদের সচরাচর যে পরিচয়, তাহা মূলবস্তুর সহিত পরিচয় নয়, তাহা সাক্ষাৎ পরিচয় নয়, তাহা হইতেছে গৌণ পরিচয়। টীকাকারেরা সহায় হইতে পারেন, কিন্তু সহায়মাত্র—যদি সহায়কেই প্রধান করিয়া তুলি তবে সেটা প্রতিবন্ধকই হইয়া দাঁড়ায়। আগে জানা দরকার 'বেদের মূলভাবটা কি, বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টিভঙ্গীটা কি ছিল। টীকাভাষ্যকারের প্রয়োজন পরে—খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার যখন করিতে হইবে তখন। তা না করিয়া, আগে হইতেই যদি টীকা হাতে করিয়া বসি, মূল ছাড়িয়া সমালোচকদের বাকবিতণ্ডায় যোগদান করি, তবে দিকভ্রান্ত হইয়া যে পড়িব তাহা অনিবার্য্য। সুতরাং প্রথমেই কোন রকম সহায় না লইয়া, একেবারে বেদের নিছক মূলের সহিত

পরিচিত হইতে হইবে। শুধু বেদ কেন, সকল রকম সাহিত্য সম্বন্ধে এই কথা প্রযুজ্য। কোন কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে হইলে আগে সে কাব্যের সমালোচনা নয়, আগে তাহার শুধু মূলটি সাক্ষাৎভাবে জানাশুনা উচিত। আধুনিক যুগে প্রকৃত কাব্যরসিকের এত যে অভাব, তাহার একটি কারণ এইখানে—আমরা বৈজ্ঞানিক দার্শনিক, কালিদাস বা সেক্সপীয়রের মূল কাব্যের সহিত আমাদের যত পরিচয় তাহার অপেক্ষা বেশী পরিচয় আমাদের কালিদাস বা সেক্সপীয়র সম্বন্ধে যত সমালোচনাপুঞ্জ আছে তাহার সাথে।

যাহা হউক, এখন বেদের যে মূলভাব, তাহার সহিত পরিচয় লাভ করিবার প্রণালীটি কি? তাহা হইতেছে জানা হইতে অজানার দিকে চলা। বেদের মধ্যে সর্ব্বত্রই আমরা পাই এমন সব বিশেষ প্রণিধানযোগ্য কথা যাহার অর্থ খুবই স্পষ্ট, স্ফুট—সে গুলিকে ধরিয়া, তাহারই অভিব্যঞ্জনার আলোকে আমাদের বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে যাহা অর্দ্ধস্পষ্ট, অস্ফুট। বেদে এমন সব মন্ত্র, এমন সব পদ, বাক্য আছে—শুধু দুই একটা নয়, যথেষ্ট—যেগুলিকে একবারে আধুনিক-ভাবের বাণীই মনে হয়, অন্ততঃ আধুনিক বুদ্ধির কাছেও খুব পরিচিত বলিয়াই বোধ হয়। এই সব স্থানে যে অর্থ স্বতঃই ফুটিয়াছে, তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত—বেদ বলিয়া, প্রাচীন রচনা বলিয়া, সে সকলের সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, তাহাতে কষ্টকল্পিত কিছু আরোপ করার কোন সার্থকতা নাই। "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" অথবা "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং দিবীব চক্ষুরাততং" অথবা "বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানো মহো জ্যোতিষং পরমে ব্যোমন্‌"—এই যে কথাগুলি, এসব কি অস্পষ্ট না অস্ফুট? এখানে অর্থই যে পরিষ্কার প্রাঞ্জল কেবল

তাহা কি, যে ভাবের দ্বারা কথাগুলি অনুপ্রাণিত তাহাও কি তেমনি পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল নয়? এ সব স্থানে শিশু মন, আদিম মন, প্রাকৃতিক মন, এমন কি আনুষ্ঠানিক মনেরও ত আভাষ কিছু পাই না। পাই পরিণত মনের, জ্ঞানদীপ্ত মনের, নিবিড় তত্ত্বানুভূতির কথা—কথা, সুর, ছন্দ সবই। আরও ধরুন একটি শ্লোক—

চোদয়িত্রী সূনৃতাণাং চেতন্তী সুমতীনাং
যজ্ঞং দধে সরস্বতী।
মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা
ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি।

এখানেও মূল ভাবটি কি খুবই দুর্জ্ঞেয়? সহজ বোধে এখানেও পাই তত্ত্বানুভূতির কথা, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা, মনস্তত্ত্বের কথা। সায়ণাচার্য্য এই শ্লোক কয়েকটির প্রাকৃতিক ও যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা নিষ্কাসন করিতে যে কি গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াছেন তাহা দেখিলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। সরস্বতীকে আমরা জ্ঞানের দেবী বলিয়াই জানি, সুতরাং 'ধিয়াবসু' (অর্থাৎ ধী হইতেছে যাহার সম্পদ্) 'ধিয়ো বিশ্বা' 'সুনৃত' (ঋত ও অমৃত কথা দুইটি সাধারণের খুব অপরিচিত নয়), 'সুমতি', প্রভৃতি কথা যে তাঁহার সম্পর্কে ব্যবহৃত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। 'ধী" শব্দটি সর্ব্বজন পরিচিত, কিন্তু সায়ণের ও রকম সহজ অর্থ গ্রহণ করিলে চলে না, তাই তিনি 'ধী' অর্থ করিলেন 'কর্ম্ম', তারপর 'অর্থাৎ' দিয়া যোগ করিলেন 'বর্ষণ কর্ম্ম'। আর একটি জায়গায় মিত্র ও বরুণের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যে এই দুইটি দেবতা এমন ধী গড়িয়া গেলেন যাহা হইতেছে 'ঘৃতাচীং' (ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা—১-২-৭)। এ তবে কি ঘৃত-মাখা ধী অর্থাৎ বৃষ্টি? না, তাও নয়—সায়ণের মতে ধিয়ং ঘৃতাচীং অর্থ জল

ঢালে যে বৃষ্টি—ঘৃত অর্থ জল! ঘৃ ধাতু অর্থ যে 'দীপ্ত করা'ও হয়, সায়ণ নিজেই তাহা বলিয়াছেন আর এক জায়গায় (১-১৪-৬), সুতরাং 'ধিয়ং ঘৃতাচীং' কথার সহজ অর্থ উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময় বুদ্ধি। কিন্তু সায়ণাচার্য্য ঘি অর্থে জল ও বৃষ্টিই বেশী পছন্দ করেন। ঘৃত অর্থ যেখানে দীপ্তি সায়ণ করিয়াছেন সে জায়গাটি দেখিলে আমরা আরও স্পষ্ট বুঝিব যে এই দীপ্তি বাহিরের আলো পর্য্যন্তও নয়, ইহা অন্তরেরই জ্যোতি। সেখানে অগ্নিকে বলা হইয়াছে 'ঘৃতপৃষ্ঠ'। এই বিশেষণের সাথে সাথেই আবার আর একটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে 'মনোযুজ' অর্থাৎ অগ্নিকে মনের সহায়ে বাঁধিতে হয়—এই কথাই ঋষি বিশ্বামিত্র আর এক জায়গায় বলিতেছেন, "বৈশ্বানরং মনসা অগ্নিং নিচায্য"। এই অগ্নির স্বরূপ যে কি তাহা একেবারে প্রথম সূক্তেই বেশ স্পষ্ট বলা হইয়াছে। অগ্নি হইতেছেন 'কবিক্রতু'। 'ক্রতু' অর্থ সায়ণ নিজেই বলিয়াছেন ক্রিয়া, কর্ম্ম। আমরা বলি 'ক্রতু' হইতেছে ক্রিয়াশক্তি, কর্ম্মশক্তি—গ্রীক Kratos। সুতরাং 'কবিক্রতু' অর্থ কবির কর্ম্মশক্তি বা সৃষ্টিপ্রতিভা যাহার। কবি অর্থ যে স্রষ্টা তাহা সকলেই জানেন। সকল দেবতাকেই অথবা যে মানুষ দেবতার জ্ঞান বা সাক্ষাৎ পাইয়াছেন তাহাকেই বেদ বলিয়াছেন কবি, মনীষী। অগ্নি 'কবিক্রতু' অর্থ অগ্নি হইতেছে দৃষ্টিযুক্ত কর্ম্মশক্তি। কিন্তু এই সহজ অর্থটা ভয়ানক রকম আধ্যাত্মিক হইয়া পড়ে, অগ্নি আর আমাদের পরিচিত আগুণ থাকেন না, তাই 'কবি' অর্থ সায়ণ করিলেন 'ক্রান্ত'—'কবিক্রতু' অর্থ যজ্ঞকর্ম্মকে নিষ্পাদন করে যাহা। আরও একটি উদাহরণ আমরা লইব—যে কথাটা আমরা সকলেই জানি সেই গায়ত্রী মন্ত্র। "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো য নঃ প্রচোদয়াৎ" (৩-৬২-১০); এই মন্ত্রটির সহজ ও ন্যায্য অর্থ এই—দেব

(অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়, দিব্ দ্যোতনে) সবিতার তেজ আমরা বরণ করি, আমাদের 'ধী'র মধ্যে ধারণ করি, এই 'ধী' তিনি আমাদের দিকে প্রেরণ করুন। সুতরাং যে জ্যোতির্ম্ময় সবিতা 'ধী'র কর্ত্তা তিনি যে আকাশের সাধারণ সূর্য্য কেবল নহেন, এই অনুমান করা কি সঙ্গত নয়? অনুমানই বা করিতে হইবে কেন, উপনিষদ্ ত স্পষ্টই বলিয়াছেন, সবিতা অর্থ সত্যের প্রসূতি—"সবিত্রে সত্যপ্রসবায়" (ছান্দোগ্য ৬-৪-১৯)। আর জ্ঞান সূর্য্য, জ্ঞান জ্যোতি—এ সব কথা ত আমাদের একান্ত অপরিচিত নয়। এ রকম উপমা বা রূপক আমরা ত প্রতিনিয়তই ব্যবহার করি। বৈদিক ঋষিরা এই উপমা ব্যবহার করিলেই কি তাহা হইবে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা—ধী কথাটা কেবল কবিতা, অতিশয়োক্তি? পরিশেষে আর একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিবার লোভ আমরা সম্বরণ করিতে পারিলাম না। অতি সহজ কথা, অতি সহজ ভাব কত কষ্টে যে কতদূর বিকৃত করা যাইতে পারে তাহা এই একটি নমুনা হইতেই বুঝা যাইবে, বেদের উপরে ভাষ্যকারদের হাতে যে কি ভয়ানক অত্যাচার হইয়াছে তাহাও এই একটি কথাতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বেদে কথাটি আছে "অমৃতস্য বাণী"—বেদের মর্ম্ম ভাব ভঙ্গী সব এই দুইটি শব্দতেই সকলের কাছে ব্যক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু আচার্য্য সায়ণ এই কথাটির অর্থ কি করিয়াছেন, জানেন? 'অমৃতস্য বাণী' অর্থ 'উদকস্য ধারা' (১০-১২৩-৩), অমৃতের বাণী হইতেছে জলের স্রোত !!!

ফলতঃ আমরা যাহা বলিতে চাই তাহা এই, বেদ হইতেছে তাত্ত্বিক জ্ঞানের, অধ্যাত্ম উপলব্ধির, যোগলব্ধ অনুভূতির কথা। বেদের মূল ভাব, মূল রহস্য খুঁজিয়া পাইতে হইলে, পাইব এইখানে;

এই এই দিক দিয়া চলিলে দেখিব কেমন সহজে সুসঙ্গতভাবে কেমন আপনা হইতেই সমগ্র বেদের অর্থ বাহির হইয়া আসিতেছে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ স্থানে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতে হইলে অনেক গোলমাল অনিশ্চয়তা আসিয়া পড়িবেই। কিন্তু তাহাতে সমস্তের মূল ভাবটা, আসল তত্ত্বগুলি ধরিতে কোন প্রতিবন্ধক আসিবে না, যদি বুদ্ধির কম্পাসটি ঠিক মুখে ধরিয়া রাখিতে পারি। ব্যাসকূট আছে বলিয়া মহাভারত কি অবোধ্য? আর বেদের এই যৌগিক প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিলেই হিন্দু শিক্ষায় বেদ এতখানি মর্য্যদা কেন পাইয়া আসিতেছে তাহারও একটা ন্যায়সঙ্গত হেতু আমরা পাইব।

প্রথম দৃষ্টিতেই তবে বেদের মধ্যে পাই এই রকম একটা চিত্ত-বিভ্রান্তকারী দৃশ্য। আধ্যাত্মিক কথা, তত্ত্বকথা—শব্দ, বাক্য, শ্লোক সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে অর্থাৎ যে সব কথা আমরা আধুনিকেরা স্বতঃই ও সহজেই আধ্যাত্মিক বলিয়া বুঝিতে পারি। সেই সঙ্গে সঙ্গে, তাহারই মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া আছে আবার যাজ্ঞিক, প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, সামাজিক আরও কত রকমের জিনিষ। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই সকলের মধ্যে কোন্‌টি মূল, আর কোন্‌টি শাখা, কোন্‌টি মুখ্য আর কোন্‌টি গৌণ। পাশ্চাত্যেরা আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক জিনিষটিকে মোটেও আমল দিতে চাহেন নাই, দিলে তাঁহাদের যে একটা সাধের মতবাদ আছে তাহা ধূলিসাৎ হইয়া যায়, সে কথা আমরা পরে খুলিয়া বিচার করিব। পাশ্চাত্যেরা বলিতেছেন যে, প্রকৃতির পূজা করিতে করিতে, প্রকৃতি-আত্মক দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতে করিতে বৈদিক ঋষিদের মুখ হইতে হঠাৎ মাঝে মাঝে তত্ত্বকথা দুই চারিটা

বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। শিশুর মুখ দিয়াও ত ভগবান মাঝে মাঝে কথা কহিয়া থাকেন। সে সব তত্ত্ব কথা তাঁহারা সব বুঝিয়া সুঝিয়া বলেন নাই (They did not mean what they said)। আমরা আধুনিকেরা যদি সে সকলের মধ্যে অতি গভীর সূক্ষ্ম দার্শনিক ধারা আবিষ্কার করিতে যাই তবে সে চেষ্টা হইতেছে প্রাচীন মনের উপর আধুনিক মনের আরোপ মাত্র। কিন্তু এই ভাবে চলিয়া ইউরোপ সমস্ত বেদের একটা সুসংলগ্ন ব্যাখ্যা বাহির করিতে পারেন নাই। যে পথে চলিয়া পণ্ডিত ম্যাক্সমুলর 'পরমহংস' কথাটিকে "The Great Goose" বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন সে রকম 'মাছি মারা' অনুবাদে যে বেদের কোন কূল কিনারা পাওয়া যাইবে না তাহা অনিবার্য্য। অন্যপথে চলিলে কি ফল হয় তাহা এখন একবার চেষ্টা করিয়া দেখা কি উচিত নয়?

সায়ণাচার্য্য নিজে যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোথাও বলেন নাই যে বেদের অন্য অর্থ হইতে পারে না। বেদের যে একটা আধ্যাত্মিক অর্থ হইতে পারে, তাহা তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন। শুধু তাই নয়, অনেক জায়গায় বিকল্পে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন, এমন কি দুই এক স্থানে অন্য অর্থ কোন রকমে বাহির করিতে না পারিয়া শুধু আধ্যাত্মিক অর্থই দিয়াছেন (১-১৬-৪)। তবে সায়ণের কাজই ছিল যাজ্ঞিক ব্যাখ্যাটি দেওয়া, যজ্ঞের অনুষ্ঠান কি রকম ছিল তাহা দেখাইবার জন্য, তাহাকে আবার সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য, এবং সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী পথে তিনি চলিয়াছিলেন। শুধু সায়ণে কেন, বেদের প্রাচীনতম ব্যাকরণ নিরুক্ত গ্রন্থেও বেদের

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অনেক ইঙ্গিত পাই। একটি এখানে কেবল আমরা উল্লেখ করিতেছি, নিরুক্তকার ইন্দ্রের যে সব অর্থ দিয়াছেন একটা তাহা এই—শরীরমধ্যবর্ত্তী প্রাণ ভাবেন ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞকঃ।

কিন্তু আসল ব্যাপার হইতেছে এই যে, বেদ শুধু একখানা সাহিত্য-পুস্তক নয়, বেদ হইতেছে অধ্যাত্ম-সাধনার মন্ত্রাবলী। এই অধ্যাত্ম-সাধনা যাহার কিছু নাই তাহার পক্ষে বেদ বুঝিতে যাওয়া অনধিকার চর্চ্চা। শূদ্রের পক্ষে বেদ পাঠ যে কেন নিষিদ্ধ হইয়াছিল তাহার কারণও এইখানে। শুধু বিচার বুদ্ধি একটু মার্জ্জিত হইলেই বেদরহস্য হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, দরকার অন্তঃকরণের শুদ্ধি। আমরা তর্ক বিতর্ক করিয়া বেদের ভাষার অর্থ বাহির করিতে যাই, কিন্তু সেই ভাষা যে অন্তরঙ্গ ভাবের অভিব্যক্তি, তাহার খোঁজ কেমন করিয়া পাইতে হয় তাহা জানি না, তাহার চেষ্টাও করি না। যে সাধনার উপর বেদের তথ্য প্রতিষ্ঠিত, সেই সাধনা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, সুতরাং তর্কবুদ্ধি যে আমাদিগকে অপথে বিপথে লইয়া যাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের কি? নৈষা তর্কেণ মতিরাপণীয়া—একথা ত উপনিষদকার বহু পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছেন। ২২২।৬

ফলতঃ, বেদ বুঝিবার জন্য যদি সাহায্য লইতে হয় তবে উপনিষদের কাছেই প্রথমে যাওয়া উচিত। কারণ, উপনিষদের তত্ত্ব সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সে সাধনা বৈদিক সাধনারই সহিত সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত। উপনিষদই বেদের জীবন্ত ভাবের প্রথম ব্যাখ্যা ভাষ্য বা টীকা। উপনিষদ্ হইতেছে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির, তত্ত্বানুভূতির, দর্শনের অর্থাৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টির কথা—আমরা সকলেই

জানি ও মানি। এই উপনিষদ্ ত স্পষ্টই বলিতেছে, "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" (কঠ)। * পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি উপনিষদের ঋষি তাঁহার দর্শনের কথা বলিতে বলিতে বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া চলিয়াছেন, সুতরাং উপনিষদকার বেদকেও যে দর্শনের পর্য্যায়েই স্থান দিতেন, তাহাকে শুধু প্রাকৃতিক বা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ন্যায্য। এই ধরুন, মুণ্ডক উপনিষদ্ যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অথবা প্রাকৃত ও দিব্যসত্তার কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—'দ্ব-সুপর্ণা' ইত্যাদি—এই সমস্ত শ্লোকটি হুবহু ঋগ্বেদীয় ঋষি দীর্ঘতমার মন্ত্র হইতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। অথবা ঈশ উপনিষদ্ তাহার বক্তব্য শেষ করিয়াছে যে শ্লোকটি দিয়া, সেই 'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে' ইত্যাদি, তাহাও ঋগ্বেদেরই একটি মন্ত্র—ঋষি অগস্ত্য এই মন্ত্রেই আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহার অগ্নিসূক্ত (১-১৮৯-১)। উপনিষদ্ যে এই রকম কত মন্ত্র বেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তারপর যেখানে হুবঁহু উদ্ধৃত করেন নাই সেখানেও কথার ও ভাবের মিল এমন আছে দেখিতে পাই, যে মনে হয় উভয়ের প্রাণের সুর এক, উভয়ের অন্তরাত্মার দৃষ্টি এক। উপনিষদের সেই বিখ্যাত উক্তি—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—আমাদের সকলেরই জানা, কিন্তু আমরা জানি কি যে এটি বেদেরই একটি মন্ত্রের প্রতিধ্বনি? সে মন্ত্রটি এই—

* শঙ্করাচার্য্য 'সর্ব্বে বেদাঃ' অর্থ করিয়াছেন বেদের এক অংশ অর্থাৎ উপনিষদ্। কিন্তু 'সমস্ত' অর্থ 'এক অংশ'—এরূপ কষ্ট কল্পনা কেন? শঙ্করও বেদকে শুধু কর্ম্মকাণ্ড অর্থাৎ বাহ্যিক যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যাপার বলিয়া জানিতেন, তাই তাঁহার এই বিকৃত ব্যাখ্যার চেষ্টা।

উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিস্পশ্যন্ত উত্তরং।

দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমং॥ (১-৫০-১০)

উপনিষদে যে পাই—

হৃদী মনীষা মনসাঽভিক্লপ্তো ইত্যাদি (ছান্দোগ্য)

তাহারও প্রতিরূপ বেদে রহিয়াছে—

হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা। (১০-১২৯-৪)

অথবা—

ইন্দ্রায় মনসা মনীষা প্রত্নায় পত্যে ধিয় মর্জ্জয়ন্ত। (১-৬১-২)

ইন্দ্রের যে তাত্ত্বিক সত্তা—psychological personality, তাহা কি এই কথা কয়টিতে বেদ স্পষ্টই ব্যক্ত করে নাই?

তারপর বিশ্বামিত্রের যে কয়েকটি কথা অগ্নি সম্বন্ধে পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি—বৈশ্বানরং মনসাগ্নিং নিচায্য ইত্যাদি—তাহারই ব্যাখ্যা কি উপনিষদ্ করিতেছে না এই ভাবে—

স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধিতমেতৎ নিহিতং গুহায়াং। * (কঠ)

এই যে 'নিহিতং গুহায়াং' শব্দটি তাহাও প্রণিধানযোগ্য। উপনিষদে যেখানে সেখানে পাই 'গুহাহিতং', 'গহ্বরেষ্ঠং', 'হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'—বেদেও পাই সেই রকমই, এই যেমন—'অন্তঃসমুদ্রে হৃদ্যন্তর্' । তারপর পরমং পদং, পরমেব্যোমনি, পরমে পরাকাৎ,

* এই স্বর্গ শুধু পৌরাণিক স্বর্গ (অর্থাৎ paradise) নয়, এই স্বর্গেই রহিয়াছে অমৃতত্ব—"স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে"। শঙ্কর অবশ্য স্বীকার করিবেন না যে এই অমৃতত্ব হইতেছে সচ্চিদানন্দের অমৃতত্ব। কিন্তু এই কঠোপনিষদেই একটু পরেই আছে "মর্ত্তোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্মসমশ্নুতে।"

পরমে পরার্দ্ধে, উত্তর বা উত্তম সধস্থ—প্রভৃতি বেদে উপনিষদে সমান ভাবে ছড়াইয়া আছে।

এই রকম সব বিশেষ ভাবব্যঞ্জনাপরিপূর্ণ একই শব্দ কথা বেদে উপনিষদে যে কত আছে তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। সত্যং, ঋতং, অমৃতং, বৃহৎ, ধী, জ্যোতি—প্রভৃতির আধ্যাত্মিক অর্থ উপনিষদ্‌কার প্রথম যে আবিষ্কার করিয়াছেন, বেদে তাহাদের দিন নেহাৎ প্রাকৃত অর্থ—এই সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। উপনিষদ্ বেদের কথাগুলি শুধু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ভাব গ্রহণ করেন নাই, বেদের কথা সব জড়ভাবের কথা, উপনিষদ্‌ই তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিকভাব তাহার মধ্যে অনুস্যূত করিয়া দিয়াছেন, এই অনুমানকে কুসংস্কারই (prejudice) আমরা বলিতে চাই। উপনিষদ্ বেদের কথা এত ব্যবহার করিয়াছেন এবং বারবার এমন সুসঙ্গত ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, যে সে সব কথার ঔপনিষদিক কোন ব্যঞ্জনা আগে হইতেই না থাকিলে, সেগুলি এমন ভাবে উপনিষদ্ আপন তত্ত্বাব্যাখ্যানে প্রয়োগ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তা ছাড়া আছে গঠন-প্রকৃতির, ভঙ্গীর, সুরের—styleএর কথা। বেদের প্রতিবাক্যে প্রতি-মন্ত্রে আছে যে গভীর তত্ত্বানুভূতির মূর্চ্ছনা তাহা আমাদের দেশের বৈয়াকরণিকদের কি ইউরোপীয়দের স্থূল কর্ণপটাহে ধরা পড়ে নাই।

উপনিষদ্ ছাড়িয়া আমরা যদি পৌরাণিক যুগে আসিয়া পড়ি সেখানেও মহাভারত ইত্যাদিতে অনেকগুলি লক্ষ্যণীয় বিষয় দেখিতে পাই। অনেক নাম, অনেক ধাম, অনেক কাহিনী যে রূপক মাত্র, একটা তাত্ত্বিক বস্তুর পরিচ্ছদ বা রূপায়ণ মাত্র তাহা একটু ধ্যান দিলেই আমরা বুঝিতে পারি। আমরা দুই একটি শুধু এখানে উল্লেখ

করিব। পৌরাণিক মতে সূর্য্যের পত্নীর নাম হইয়াছে 'সংজ্ঞা'। সূর্য্যের যদি বৈদিক অর্থ গ্রহণ করা যায়—'সত্যের প্রসূতি', তবেই এ কথাটির মর্ম্ম সহজেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। তারপর গোলোকের কথা। গোলোক হইতেছে বিষ্ণুর আবাস। 'গো' অর্থ যদি ধরি জ্যোতি, পরাজ্ঞানের জ্যোতি, তবে মহাভারত কেন যে বলিতেছেন "দেবানামুপরিষ্টাচ্চগাবঃ প্রতিবসন্তি বৈ", তাহাও সরল হইয়া আসে না কি?

তারপর সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী—সাবিত্রী ও সত্যবান এই দুইটি নামই কি তত্ত্বভাবোদ্দীপক নয়? বেদ অনুসারে সত্যসূর্য্যের আর-এক নাম সবিতৃ। পুরুষ হিসাবে তিনি সত্যবান আর তাহার যে শক্তি তাহাই সাবিত্রী। সত্যের শক্তি নিষ্ঠা সত্যকে মৃত্যুর—জড়ের অজ্ঞানের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া যে আনে তাহা সাধক মাত্রই অন্তরে অনুভব করিয়াছেন। অবশ্য আমরা বলি না যে পুরাণের সব কিছুরই এই রকম তাত্ত্বিক অর্থ আছে বা হইতে পারে। আমরা শুধু বলি, *পুরাণের পিছনে আছে বা ছিল একটা তাত্ত্বিক রহস্য—একটা বৈদিক* বা ঔপনিষদিক উপলব্ধি—তাহাই ডালপালা ফলেফুলে সুশোভিত হইয়া, কল্পনার কবিত্বের আবরণে আবৃত হইয়া, সাধারণের শিক্ষার ও মনোরঞ্জনের জন্য গল্পাকারে সহজ ও সুলভ হইয়া দেখা দিয়াছে।

সে যাহা হউক, পুরাণকে বেদের ভাষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এমন কি উপনিষদকেও সম্পূর্ণ সেই ভাবে গ্রহণ করা যায় না। বেদের ভাষ্য বেদ নিজে। বেদকে বেদের সাহায্যেই বুঝিতে হইবে। উপনিষদ তাহার অনেক কাছে কাছে হইলেও, উভয়ের মধ্যে অনেক ভাবের মিল থাকিলেও, পার্থক্যও আছে অনেকখানি। বেদে

জড়বাদ আর উপনিষদে অধ্যাত্মবাদ—এই সম্বন্ধ বেদে উপনিষদে না থাকিলেও, বেদ ও উপনিষদ হইতেছে একই অধ্যাত্মবাদের দুই প্রকরণ, এই পার্থক্য স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বেদের মধ্যে যাহা সহজ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট তাহা দিয়া আরম্ভ করিয়া ক্রমে কঠিন ও অস্পষ্টের ব্যাখ্যা খুঁজিতে হইবে। এবং এই ব্যাখ্যার ধারা যে একটা আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক অনুভূতির ধারা, তাহাও বুঝাইতে আমরা প্রয়াস পাইয়াছি। * সকলের উপরে চাই দেখিবার বুঝিবার ঠিক ঠিক ভঙ্গীটি। শুধু চিন্তাবৃত্তির কৌতুহল নিবৃত্তি করিবার জন্য প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া যাঁহারা বেদের কাছে যাইবেন, তাঁহারা বেদরহস্য কিছু বুঝিবেন কি না সন্দেহ। বৈদিক ঋষিরা বেদের নিজের কথায়

ঋতসাপ আসন্ৎসাকং দেবেভিরবদন্নৃতানি

অর্থাৎ তাঁহারা ছিলেন সত্যের ধর্ম্মের জ্ঞানী, তাঁহারা দেবতাদের সহিত সত্যের ধর্ম্মের আদান প্রদান করিতেন। সুতরাং এই সত্যের ধর্ম্মকে পাইবার জন্য যাঁহার কোন আগ্রহ বা জিজ্ঞাসা নাই, তাঁহার বেদপাঠ বিড়ম্বনা—অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং।

* আমরা বেদের যে ব্যাখ্যা দিতেছি তাহাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না বলিয়া তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বলা উচিত। কারণ, আধ্যাত্মিক বলিতে স্বতঃই আমরা বুঝি উপনিষদের ব্রহ্মবাদ। বেদ ঠিক ব্রহ্মবাদ নয়, বেদ বলিতেছে সৃষ্টির মধ্যে, জীবের আধারে যে সব স্তরে স্তরে সাজান স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর মূলতত্ত্ব (সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের মত) তাহাদের কথা—তাহাদের স্বভাব ও কর্ম্মপ্রণালী, পরস্পরের সম্বন্ধ এবং 'অপরা' তত্ত্বগুলিকে 'অপরা' তত্ত্বগুলির মধ্যে রূপান্তরিত করিয়া ধরিবার সাধনা।

৩

ইউরোপীয়েরা বেদকে যে চোখে দেখেন তাহার মূল খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত একটি তথ্যের কাছে যাইতে হইবে। সেটি হইতেছে বিবর্ত্তন বা ক্রমপরিণাম বাদ (Theory of Evolution)। এই মতবাদটি ইউরোপকে এমন ভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে ইহার প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি—ইউরোপের সমস্ত দৃষ্টিকে এই জিনিষটি রঙাইয়া দিয়াছে। ক্রম-পরিণাম অর্থ ক্রমোন্নতি। মানুষ, মানুষের সমাজ ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে উন্নতির দিকে। প্রথমে মানুষ ছিল পশুবৎ, ক্রমে তাহার বুদ্ধি বিকশিত হইয়াছে, স্বভাব মার্জ্জিত হইয়াছে, এই রকমে উন্নতির পথে চলিতে চলিতে আজ সে যাহা তাহা হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং যত অতীতের দিকে যাইব, ততই আমরা মানুষের অস্ফুট অপরিপক্ক অসংস্কৃত আদিম প্রকৃতির দিকেই চলিব। সুতরাং যত প্রাচীন কালের হইবে মানুষের সৃষ্টিও ততই এই ধরণের হইতে বাধ্য। বেদ যখন খুব প্রাচীন কালের জিনিষ তখন তাহার মধ্যে অধুনিক কালের উপযোগী সুস্পষ্ট তত্ত্বকথা, দার্শনিক উপলব্ধি যে কিছু থাকিতেই পারে না তাহা স্বতঃসিদ্ধ। বেদের মধ্যে আধুনিক মনের খোরাক খুঁজিতে যাওয়া অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং নিরর্থক প্রচেষ্টা।

কিন্তু ইদানীন্তনকালে এই বৈজ্ঞানিকদিগেরই চোখে একটা বড় অদ্ভুত বিসদৃশ ব্যাপার অকাট্য প্রমাণ লইয়া উপস্থিত হইতেছে। তাহাতে প্রিয় পরিচিত অনেক স্থিরপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই পর্য্যুদস্ত হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। সে ব্যাপারটি এই। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রাচীন কালের নূতন নূতন নিদর্শন সব পাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভূগর্ভের অন্তরালে, পাহাড়ের গহ্বরে, সভ্য সমাজের বাহিরে বনে অরণ্যে দূর অতীতকালের মানুষের সৃষ্টি সব তাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন। আর দেখিতে পাইতেছেন সে সকল সৃষ্টির মধ্যে অপরিণত মানব-মনের কোন চিহ্ন ত নাই বরং তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে শিক্ষাদীক্ষায় সমৃদ্ধ অতি উন্নত ধরণের প্রয়াসের নিদর্শন। বিশেষতঃ যে সকল স্থান আমরা এযাবৎ মনে করিতাম অসভ্য বর্ব্বরদের বাস, ঠিক সেই সেই স্থান হইতেই এই সব নিদর্শন বাহির হইয়া পড়িতেছে। আমেরিকার জঙ্গলে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে, মধ্য এশিয়ার মরুভূমির তলে—সুপ্রাচীন যুগের যে সকল শিল্পকলা, কারুকার্য্য, কীর্ত্তিকলাপ প্রকট হইয়া পড়িতেছে, তাহাদের মধ্যে পাই যে চিন্তা-শীলতা, কর্ম্মদক্ষতা, সূক্ষ্মমার্জ্জিত বৃত্তির পরিচয় তদনুরূপ কিছু এই বিংশশতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানদৃপ্ত সভ্যসমাজে মিলে কিনা সন্দেহ। ব্যাবিলন মিশর দেশের সভ্যতার কথা জানিতাম, কিন্তু তাহাদের মূল যে কত অতীতে প্রসারিত তাহা এই সবে মাত্র আমরা জানিতে আরম্ভ করিয়াছি। গ্রীসকেই আগে ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষার উৎস বা প্রতিষ্ঠা বলিয়া মানা হইত, কিন্তু কাছেই ক্রীটদ্বীপে যে গ্রীসের অপেক্ষা কত পুরাতন, তেমনি উন্নত এক সভ্য সমাজ বিস্তৃত ছিল তাহা আর আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আটলান্‌টিস্, সুমেরিয়া, আকাদ,

আজ্‌টেক, মায়া, টল্‌টেক প্রভৃতি অতিপুরাতন সভ্যসমাজের কথা আর একান্ত কবিকল্পনা বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই সব কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছি—সে সব যুগের মানুষ হইতে শিক্ষাদীক্ষায় আমরা যে খুব বেশী উন্নত হইয়া পড়িয়াছি তাহা আর জোর করিয়া বলা চলিতেছে না। পৃথিবীর বয়স চার হাজার বৎসর বাইবেলের এই কথা অলক্ষিতে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর একটা বিষম ছাপ দিয়া গিয়াছিল—আজ পৃথিবীর বয়স দূরের কথা, মানুষেরই বয়স অর্থাৎ সভ্য শিক্ষিত মানব সমাজেরই বয়স প্রায় লক্ষ বৎসর দিয়া পরিমাপ করিবার মত হইয়া পড়িতেছে!

সৃষ্টিতে ক্রমবিকাশ, মানুষের মধ্যেও ক্রমোন্নতি বলিয়া একটা জিনিষ থাকিতে পারে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা যে ধারণা করিয়া বসিয়াছিলেন যে এই ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির ধারা চলিয়াছে বরাবর একটানা সরল রেখায় আর খুব অল্পকাল ব্যাপিয়া, তাহা আজ ধুলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। আজ আমরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি যে সৃষ্টির প্রবাহ, মানুষের অগ্রগতি চলিয়াছে ঘুরিয়া ফিরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া—চক্রবৎ—উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া; আর সে গতিবেগ যে কত ধীর মন্থর তাহা একরকম ধরাই যায় না। ভারতে যে যুগভেদের, মন্বন্তরের কল্পনা ছিল ক্রমে ক্রমে আমরা সেই তথ্যই স্বীকার করিতে যাইতেছি। ফলে, এতদিন আমরা যে সব জাতিকে আদিম অনুন্নত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, যাহাদিগকে মানবজাতির গোড়াকার পশুভাবেরই উদ্বর্ত্তন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার শত জালজঞ্জালের অন্তরালে, তাহাদের আচার ব্যবহার ধর্ম্মকর্ম্মাদির মধ্যে গভীরতর

অনুসন্ধানের ফলে বাহির হইয়া পড়িতেছে এমন সব জিনিষ যাহা শিশু-মন, আদিম প্রকৃতি বা পশুভাবের সহিত আর খাপ খাওয়ান যাইতেছে না। তাই অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বলিতে সুরু করিয়াছেন যে আদিম জাতিরা মোটেই আদিম নয়, তাহারা বহু পুরাতন যুগের একটা বিরাট সভ্যতার শিক্ষাদীক্ষার ধ্বংসাবশেষ। জগতে একদিকে উন্নতি চলিয়াছে যেমন, অন্যদিকে তেমনি অবনতিও চলিয়াছে—আদিম জাতিরা এই অবনতির ধারার পরিচয়। 22219

তাই যদি হয়, মানুষ যদি পৃথিবীর অতি পুরাতন জীব এবং তাহার বিবর্ত্তন যদি হইতে থাকে উত্থান পতনের ভিতর দিয়া, তবে বেদের সময় যে বেদধর্ম্মীদের, আর্য্যজাতির একটা খুব উন্নতির যুগ ছিল না, এ কথাটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নাও হইতে পারে। অবশ্য এই বৈদিক যুগের শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা ঠিক আধুনিকদের মতই হইতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। সে যুগের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টিপ্রকরণ ছিল অন্য প্রকার, কিন্তু তাই বলিয়াই আমাদের অপেক্ষা তাহারা যে জ্ঞানে গুণে কম গরীয়ান ছিল এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। বাল্মীকি ও রবীন্দ্রনাথ এক ধরণের কবি নহেন, কিন্তু তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে বাল্মীকির উপরে কবি হিসাবে উচ্চতর আসন নিঃসঙ্কোচে কি আমরা দিতে পারি? বৈদিক ঋষিদের শিক্ষাদীক্ষা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের শিক্ষাদীক্ষার অনুরূপ না হইলেই যে তাহা পচিয়া গেল, এরূপ বিশ্বাস কুসংস্কার ছাড়া আর কি?

বাস্তবিক এইখানেই আমাদের আধুনিকদের মস্ত ভুল। প্রাচীনেরা যে কি চোখে জিনিষকে দেখিতেন, তাঁহাদের চলন বলনের ভঙ্গী যে কি ছিল তাহা আমরা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। প্রাচীন

যুগের কঙ্কালটা পড়িয়া আছে, আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না এককালে এটি ছিল একটি চলন্ত মানুষ, শুধু তাই নয়, মহামনীষীর দেহ। আমাদের ধারণা কঙ্কালটা চিরকালই ছিল কঙ্কাল. বড় জোর একটা মরা মানুষ। পাশ্চাত্যেরা আমাদের ধরণ-ধারণ—আমাদের খালি গা, শুধু হাতে খাওয়া দেখিয়া যেমন মনে করে বা সে দিন পর্য্যন্তও মনে করিত যে আমরা অসভ্য বর্ব্বর, ঠিক তেমনি বৈদিক ঋষিদের গো অশ্ব সোমরস দেবতা প্রভৃতি দেখিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলি যে তাঁহারা ছিলেন আদিম (Primitive) মানুষ। কারণ শিক্ষিত মার্জ্জিত মানুষ ঐ রকম স্থূল বিষয়ের কথা ভূতপ্রেতের কথা বলে না, তাহারা বলিবে বিজ্ঞানের কথা, বাদবিচারের কথা, তত্ত্বের কথা। আমাদের মস্তিষ্কের গড়ন দিয়া আমরা বিচার করিতে যাই প্রাচীনদের মস্তিষ্কের গড়ন। কিন্তু প্রাচীনদের ছিল যে একটা নিজস্ব শিক্ষাদীক্ষা একটা গভীর দর্শন, জগৎ সম্বন্ধে মানুষ সম্বন্ধে একটা তত্ত্বসিদ্ধান্ত তাহা আমাদের বর্ত্তমানের ধরণধারণের সহিত না মিলিলেই হইয়া পড়িবে হীনতর স্তরের, প্রাকৃতবুদ্ধিজাত এমন কি কথা আছে? ফলতঃ প্রাচীনেরা যে সত্য দেখিয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন তাহা আদৌ প্রাকৃতবুদ্ধির জিনিষ নহে—প্রাকৃতবুদ্ধির সত্য বরং আমাদের বর্ত্তমান যুগের সত্য। কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার।

আমরা যে ধরণে সত্য আবিষ্কার করি, উপলব্ধি করি—তর্কবুদ্ধির দ্বারা, প্রাচীনেরা সেই ধরণে করিতেন না। তাঁহারা সত্যকে সাক্ষাৎ দেখিতেন, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতেন। তর্কবুদ্ধি ছাড়া মানুষের আছে আরও সূক্ষ্মতর গভীরতর ব্যাপকতর জ্ঞানের বৃত্তি। সেই

বৃত্তির চর্চ্চা করা, উদ্বোধন করা এবং তাহারই সহায়ে সত্যকে আবিষ্কার করা—আবিষ্কার করা শুধু নয়, গোচর করিয়া জীবনে জাগ্রত করিয়া ধরাই ছিল তখনকার যুগের শিক্ষা ও সাধনা। একান্ত চক্ষু দিয়া নয়, একান্ত কর্ণ দিয়া নয়, একান্ত স্পর্শ দিয়া নয়, একান্ত মন বুদ্ধি দিয়াও নয়—কিন্তু এই সকল স্থূল পৃথক পৃথক যন্ত্র যে মূল বৃত্তির অভিব্যক্তি, সমগ্র অন্তরাত্মার সেই সূক্ষ্ম একমুখী দৃষ্টি ও অনুভূতিই ছিল তাঁহাদের জ্ঞানের মুখ্য উপায়। কেন-উপনিষদ্ এই মৌলিক জ্ঞান-শক্তির খোঁজ করিতে যাইয়াই বলিয়াছেন—"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ—শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ" ইত্যাদি।

প্রাচীনদের জ্ঞানবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত এই সূক্ষ্ম উপলব্ধির উপর। এই সূক্ষ্ম উপলব্ধিরও আছে যে আবার নানা স্তর, বিভাগ বা রূপভেদ,—বৈদিক ঋষির ইলা, সরস্বতী, সরমা, দক্ষিণা অর্থাৎ শ্রুতি (Revelation), স্মৃতি (Inspiration), বোধি (Intuition) ও বিবেক (Discrimination)—সে রহস্যের প্রসঙ্গ এখানে আর আমরা উত্থাপন করিব না। আমরা দেখাইতে চাই শুধু আধুনিকের ও প্রাচীনের দৃষ্টিভঙ্গীর মোটামুটি পার্থক্য এবং আধুনিকেরা যে প্রাচীনকে বুঝিতে পারে না তাহার মূল কারণ।

প্রাচীনদের জ্ঞানানুভূতির বিষয় ছিল সূক্ষ্মতত্ত্বের কথা। আধুনিক বিজ্ঞানে বা দর্শনেও তত্ত্বেরই কথা বলে বটে, কিন্তু তাহা হইতেছে তর্কবুদ্ধিজাত অর্থাৎ সে তত্ত্ব হইতেছে 'থিওরি'—বস্তুকে বিষয়কে শৃঙ্খলিত করিবার, সাজাইয়া ধরিবার কৌশল বা সাধারণ সূত্র। প্রাচীনদের সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতেছে সূক্ষ্ম সত্য ও শক্তি। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে থাকিয়া যে শক্তিপ্রবাহ খেলিতেছে, আরও সূক্ষ্মে রূপান্তরিত

হইয়া চলিয়াছে এবং সূক্ষ্মতম স্তর হইতে স্থূলে বিকশিত হইয়া চলিয়াছে তাহাদের স্বরূপ স্বধর্ম্ম নিরূপণ করাই ছিল প্রাচীন ঋষিদের বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের সহায়ে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, সৃষ্টি বা জগৎ হইতেছে নানাস্তরে বিভক্ত—স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ক্ষেত্র বা লোক একের উপরে আর একটি উঠিয়া চলিয়াছে—সানোঃ সানুমারুহৎ, উত্তরে স্তোমাঃ ; সমস্তের মধ্যে একই সত্তা—বৃহৎ দেবতা —প্রতিষ্ঠিত এবং একই শক্তি লীলায়িত, স্তর ক্ষেত্র ভেদে কেবল তাহার রূপ বিভিন্ন, কর্ম্ম বিভিন্ন। তবুও সকল সত্তা, সকল শক্তি মূলতঃ একই বলিয়া প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের রহিয়াছে একটা ভঙ্গীগত সাম্য (symmetry)। আবার কোন বিশেষ স্তরের যে সত্য তাহার প্রতিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে অন্যান্য স্তরে—কারণ একই শক্তি সূক্ষ্মতম হইতে নামিয়া আসিয়াছে স্থূলতমে—সকল স্তরের ধর্ম্মে পরস্পরের মধ্যে রহিয়াছে একটা সমছন্দ (parallelism)।

এই যেমন, বৈদিক ঋষি যখন অগ্নির কথা বলিতেছেন, তখন তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন সেই বস্তু যাহার স্থূল রূপ বা বিগ্রহ হইতেছে আগুণ, সূক্ষ্ম তত্ত্বের জগতে তাহাই তেজঃ, আরও সূক্ষ্মতর বা অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে তাহাই আবার চিন্ময় তপঃ। সূর্য্যও এই রকমে পর্য্যায়ক্রমে এবং যুগপৎ হইতেছেন আলোক, প্রকাশ, জ্ঞান। যখন প্রকৃতির একটা দৃশ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাচ্চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা— "এই যে সকল জ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি আসিয়াছে, সর্ব্বব্যাপী হইয়া আমাদের সম্মুখে জন্মিয়াছে এক বহুভঙ্গিম জ্ঞান"—তখন স্থূল উষার আগমনকে ধরিয়াই ব্যক্ত করা হইতেছে একটা সূক্ষ্মতর উষার

আবির্ভাব। ঋষিদের দৃষ্টিতে সমগ্র সৃষ্টিটি তাহার সমগ্রত্ব লইয়া প্রতিভাত হইত—তাই তাঁহাদের উপলব্ধ সত্যের মধ্যে থাকিত একটা সমগ্রত্ব, সৃষ্টির সকল স্তরে সকল ধারাতেই সে সত্য প্রযুক্ত হইতে পারে। আমরা আধুনিকেরা সত্যকে একান্ত বুদ্ধিগত করিয়া দেখি, তর্কবৃত্তির ছাঁচে ফেলি, কাটিয়া কাটিয়া আলাদা আলাদা করিয়া বুঝি। প্রাচীনেরা সত্যকে অন্তরাত্মার পূর্ণতা দিয়া ধরিতেন, তাই তাহার মধ্যে ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের, রূপ ও ভাবের এক অখণ্ড বিগ্রহ ফুটিয়া উঠিত। আমাদের কাছে জড়জগতের সত্য এক, প্রাণজগতের সত্য আর, মনোজগতের আবার তৃতীয় ধরণের; প্রত্যেক ধারা প্রত্যেক ধারা হইতে ভিন্ন, এবং প্রত্যেকের পৃথক পৃথক সংজ্ঞা। প্রাচীনদের দৃষ্টি এ রকম বিশ্লেষণমুখী ছিল না, তাহাদের সমন্বয়মুখী উপলব্ধি দিত এমন মন্ত্র যাহার মধ্যে সকল ধারার অভিব্যঞ্জনাই প্রকাশ পাইত।

প্রকৃতির ধারা, পার্থিব জগৎ, কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহারা যে সব চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন তাহা একান্ত প্রাকৃত, পার্থিব, লৌকিক নহে, তাহা অতিপ্রাকৃত, অপার্থিব, অলৌকিকেরই ছায়া। প্রশ্ন হইতে পারে জড় আয়তনের জিনিষ সব যদি কেবল রূপক উপমা, তবে বেদে তাহাদের এত ছড়াছড়ি কেন, তাহাদের উপর এত জোর কেন? তাহা হইলে প্রাচীনদের যে প্রতীক-তন্ত্র (Symbolism) তাহার গবেষণা আমাদের করিতে হয়। সে সম্বন্ধে শুধু এইটুকু এখানে আমরা বলিব যে প্রাচীনদের ভাষা ছিল প্রাণের ভাষা, অর্থাৎ তখনও ভাষা এখনকার মত বুদ্ধির বিচারবিতর্কের বিশ্লেষণমুখী ভাষা হইয়া উঠে নাই, সে ভাষা ছিল জীবন্ত অনুভবের সাক্ষাৎ বিগ্রহ। সকল ভাষারই আরম্ভ ইন্দ্রিয়ানুভবের, প্রাণাবেগের তরঙ্গে। প্রাচীনদের ভাষায় ভাষার সেই

মূল প্রকৃতি অটুট ছিল, ভাষার ও সাক্ষাৎ অনুভবের মধ্যে তর্কবুদ্ধি বর্ত্তমানের মত বিচ্ছেদরেখা টানিয়া দেয় নাই। তাই অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিও ভাষায় যখন প্রকাশ পাইত, তখন স্থূল অনুভূতিও তাহার অঙ্গীভূত হইয়া যাইত। তা ছাড়া আমরা পূর্ব্বেই প্রাচীনদের অনুভূতির অখণ্ডতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহাও স্মরণে রাখিতে হইবে। আর যে সব স্থূল অনুষ্ঠান ক্রিয়াকর্ম—যজ্ঞাদি—ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা মুখ্যতঃ অন্তরের জিনিষ হইলেও, তাহাদের বাহিরের একটা স্থূল রূপ দেওয়া হইয়াছিল অন্তরের তত্ত্বকে গোচর করিয়া ধরিবার জন্য, প্রচার করিবার জন্য, উত্তরকালের জন্য ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিবার জন্য। পরবর্ত্তীযুগে লিখিত গ্রন্থ, টীকা টীপ্পনী, ভাষ্য প্রভৃতি যে কাজ করিতে পারিয়াছে ঐ অনুষ্ঠানাদিও গোড়ায় সেই কাজই করিত। বেদ বাহ্য-অনুষ্ঠান স্থাপন করিয়াছে, প্রকৃতির সহজ লীলা হইতে, তখনকার জীবনোপায়ের সমাজের ধরণ ধারণ হইতে গ্রহণ করিয়াছে প্রতীক সব অন্তরেরই সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলীর বিগ্রহরূপে। আজকাল আমরা বুঝিতে পারিতেছি না কি যে মিশরের পিরামিড মূলতঃ সমাধিস্থান হইলেও তাহা আসলে হইতেছে একাধারে শিল্পের, জ্যোতিষের, জ্যামিতির, একটা গুপ্ততত্ত্ববিদ্যার সূত্রাবলীর স্ফুট মূর্ত্তি? অপরা বিদ্যা পরা বিদ্যার ছায়া, বাহিরের যাহা তাহা অন্তরেরই প্রতিকৃতি। বেদের এই যে প্রতীক-তন্ত্র তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এক স্থানে স্পষ্টই ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—

যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ—

উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ (৮-৩)

—বাহিরে এই যতগুলি আকাশ আছে অন্তর্হৃদয়েও ঠিক ততগুলি

আকাশ, এই অন্তর্হৃদয়ের মধ্যেও আছে আবার পৃথিবী স্বর্গ, অগ্নি বায়ু, সূর্য্য চন্দ্র। কঠ উপনিষদ্‌ও তাই এক কথায় বলিতেছেন—

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।

শুধু ভারতে কেন, প্রাচীন যুগের সকল দেশেরই ধর্ম্মসাধনায় এই প্রতীক-তন্ত্রের প্রচলন ছিল। এই প্রতীকের রহস্য আমরা আর বুঝিতে পারি না বলিয়াই তাহাকে তন্ত্র-মন্ত্র ঝাড়-ফুঁক ভুতুড়ে-বিদ্যা (Black Magic) অথবা আদিম অসভ্য প্রাকৃত ভাব ইত্যাদি নাম দিয়া থাকি। মিশরের রাষ্ট্রীয় প্রতিভা, শিল্প প্রতিভা আমরা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করি, এসব বিষয়ে সময়ে সময়ে তাহাকে আমাদের সমান বা বড় বলিয়াও মনে করি, কিন্তু তাহার ধর্ম্মসাধনার প্রতিভা আমরা ধরিতে পারি না, এক্ষেত্রে তাহাকে অসভ্যের স্তরে ফেলিয়া রাখিতে কুণ্ঠিত হই না। কারণ, আমাদের ধর্ম্মসাধনা নাই, আমরা বড় জোর বুঝি নীতিকথা। গ্রীসের শিল্প সাহিত্য আমরা খুব তারিফ করি, কিন্তু ধর্ম্ম বা অধ্যাত্ম সম্বন্ধে সোক্রাতার উপরে আর উঠিয়া যাইতে পারি না। গ্রীকদের মধ্যেও প্রথম যুগে ছিল যে একটা নিবিড় আধ্যাত্মিক চর্চ্চার ধারা—তাহাদের Mysteries যে যোগ সাধনারই রহস্য এ কথা আমরা জানিয়াও বুঝি না। থেল (Thales)-এর 'জল'পূজা, হেরাক্লিত (Heraclitus)-এর 'অগ্নি'পূজা যে কেবল প্রকৃতিপূজা নয়, এই জল অগ্নি যে গভীর তত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্বেরই প্রতীক আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে চাই না। পিথাগোর (Pythagoras) বা প্লেতোর দর্শন আমরা আলোচনা করি, কিন্তু তাঁহাদের দর্শন যে সূক্ষ্মদৃষ্টি বা অধ্যাত্মসাধনার অভিব্যক্তি তাহার খোঁজ আমরা লই না। প্রাচীন চীন জাপানে, কাফ্রীদের মধ্যে, আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে জগৎ সম্বন্ধে মানুষ

সম্বন্ধে যেসব ধারণা আখ্যানাদি প্রচলিত আছে অর্থাৎ সকল "পুরাণ" বা mythology'র পিছনে লুকাইয়া রহিয়াছে যে একটা বহু প্রাচীন লুপ্ত তত্ত্ববিদ্যা, একটা গভীর আধ্যাত্মিক সাধনা তাহা বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করিবেন না বটে, কিন্তু যাঁহারা আধ্যাত্মিক সাধনার কিছু খোঁজ রাখেন তাঁহাদের পক্ষে সে কথা স্বীকার করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

প্রাচীনদের ভাষায় চিন্তায় নিছক তাত্ত্বিকতা (abstraction) তেমন পাই না, পাই যেমন একটা বস্তুতান্ত্রিকতা, তাই আমরা বলিয়া ফেলি তাঁহারা ছিলেন জড়মুখী। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁহাদের তত্ত্ব শুধু তর্কবুদ্ধির মনের চিন্তা ভাব ছিল না, তাঁহাদের তত্ত্ব ছিল স্থূলের মতনই বস্তু, তেমনি সত্য, জাগ্রত, জীবন্ত, স্পষ্ট, স্ফুট অথবা তাহা অপেক্ষাও বেশী। সূক্ষ্ম জগৎ তাঁহাদের কাছে কল্পনার বিষয় ছিল না, তাহা ছিল বস্তুজগতেরই আসল বস্তু। তাই সূক্ষ্ম জগতের কথা তাঁহাদের মুখে স্বতঃই বস্তুজগতের সংজ্ঞার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইত। আমরা আধুনিকেরাও কি সময়ে সময়ে তাহাই করি না? কবিতায় যেমন—যখন কোন গভীর নিবিড় অনুভব মর্ম্মে মর্ম্মে ফুটিয়া উঠে, তখন তাহার সত্যতা তাহার বাস্তবিকতাকে গোচর করিয়া ধরিবার জন্য আমাদিগের কি বস্তুজগতের রূপকেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না? আমাদের বৈষ্ণবশাস্ত্রে মানুষী হাবভাবের, ইন্দ্রিয়-জগতের অনুভবের সহায়েই কি ভাগবত হাবভাব অতীন্দ্রিয় অনুভব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা হয় নাই? সলোমন যখন বলিতেছেন—

A bundle of myrrh is my well-beloved unto me; he shall lie all night betwixt my breasts

—তখন তাহার মধ্যে খৃষ্টানেরা গভীর তত্ত্বকথা ছাড়া আর কিছু দেখেন না ; রুটি ও মদ খাওয়ার অনুষ্ঠানটি (Trans-substantiation) খৃষ্টানেরা কি রহস্যময় করিয়া লইয়াছেন—কেবল বৈদিক ঋষি যদি বলেন—

এমাশুম্.........পতয়ন্ মন্দয়ৎসখং *

—তবে তাহা হইবে নিছক প্রকৃতিবাদ ?

তত্ত্বকে প্রকাশ করিবার জন্য কথার কাহিনীর, রূপকের উপমার ব্যবহার সর্ব্বত্র সকল দেশেই ছিল। আধুনিক যুগে আমরা সে রীতি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়াছি বটে, কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে তাহা এখনও সম্পূর্ণ রূপে পারিয়া উঠি নাই।

বেদের আছে যে একটা আধ্যাত্মিক রহস্য তাহা আমরাই যে প্রথম আবিষ্কার করিতেছি এমন নয়, এ সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্য ও নিরুক্তের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আধুনিক কালেও এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে দয়ানন্দ সরস্বতী বোধ হয় প্রথম পথপ্রদর্শক। আজকাল পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী, শ্রীদ্বিজদাস দত্ত প্রভৃতি বঙ্গদেশে এই দিক দিয়া আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু এই সকল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সহিত আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটির অনেক পার্থক্য আছে। ফলতঃ আমাদের ব্যাখ্যাটিকে আধ্যাত্মিক না বলিয়া বলা উচিত তাত্ত্বিক। দয়ানন্দের আধ্যাত্মিকতা হইতেছে ঈশ্বরবাদ, দ্বিজদাস দত্তের আধ্যাত্মিকতা হইতেছে ব্রহ্মবাদ, আর দুর্গাদাস লাহিড়ীর আধ্যাত্মিকতা ভক্তিমূলক

* "বন্ধুবান্ধবেরা ভয়ানক কড়া মদ খাইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছেন, অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছেন"—এই রকম ব্যাখ্যাও এই শ্লোকের হইয়াছে।

ধর্ম্মভাব। বেদে এই সব জিনিষই আছে, কিন্তু খুব মোটামুটি হিসাবে, বস্তুতঃ ইঁহারা সকলেই আধ্যাত্মিকতার খুব মোটামুটি সাধারণ রূপটাই বেদের মধ্যে দেখিয়াছেন, কিন্তু বেদের রহস্য আরও গভীর, আরও সূক্ষ্ম। বেদ হইতেছে যোগবিদ্যা, যোগলব্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানের তত্ত্বাবলীর শাস্ত্র।

৪

বেদের পরিচয় বেদের নামেই। বেদ অর্থ জ্ঞান—বিদ্ ধাতু হইতে—যে জ্ঞান হিন্দুর, ভারতের, আর্য্যজাতির শিক্ষাদীক্ষার বা সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও প্রাণ, তাহাই বিশেষভাবে বেদ নামে পরিচিত। এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন একদল সাধক বা ঋষি—কবে ও কোথায় তাহা যদিও নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা দুরূহ—এবং সাধক ও ঋষি পরম্পরাই এই জ্ঞানকে বাঁচাইয়া বাড়াইয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। বেদের আর এক নাম শ্রুতি। কারণ বলা হয় এই যে, বেদমন্ত্র গুরুশিষ্য পরম্পরায় কানে কানে চলিয়া আসিয়াছে; পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকদের মুখ হইতে শুনিয়া শ্রবণে শ্রবণে ধারণ করা, রক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতেছে গৌণ বা লৌকিক ব্যাখ্যা। বেদ যে শ্রুতি, তাহার আসল কারণ এই যে, সাধক ঋষিরা তাঁহাদের বেদ বা জ্ঞান মন্ত্ররূপে দিব্যকর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন। সত্যের বাঙ্ময় বিগ্রহ যে দিব্য বাণী সাধক ঋষিরা তাহা ধ্যানে দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাই তাঁহাদের নাম মন্ত্রদ্রষ্টা এবং তাঁহাদের লব্ধ জ্ঞানের নাম শ্রুতি। বেদকে বলা হয় যে অপৌরষেয়, অনাদি, অনন্ত, তাহার কারণও এইখানে। দিব্যজ্ঞান কোন মানুষের ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নহে। দিব্যজ্ঞান হইতেছে সৃষ্টির অন্তরতম সত্য সমূহ—তাহা চিরকালই আছে ও থাকিবে। ঋষিরা কেবল তাহার মুখপাত্র বা প্রকাশের যন্ত্র।

বেদের যে আধুনিক রূপ আমরা দেখিতে পাই, তাহা গোড়ায় ছিল না। বেদ বলিয়া একখানা গোটা গ্রন্থ একটি বিশেষ স্থানে বা বিশেষ যুগে রচিত হয় নাই। বেদের মন্ত্ররাজী নানা ঋষি নানা যুগে এবং হয়ত নানা স্থানে দেখিয়া প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। এই রকমে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বেদরাজী প্রথম প্রথম ছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, অশৃঙ্খলিত। পরে সেগুলিকে যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া, একত্র করিয়া, সাজাইয়া গুছাইয়া তোলা হইয়াছে। তখন পুরাতন মন্ত্র সব কতক পাওয়া গিয়াছে, কতক পাওয়া যায় নাই—বেশীর ভাগই পাওয়া যায় নাই, নষ্ট হইয়া গিয়াছে—আর কতক বা নূতন নূতন রচিত হইয়া পুরাতনের সাথে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই সংগ্রহের চেষ্টা যে একেবারেই হইয়াছে, তাহা নহে। প্রথমতঃ আমরা যে বলিলাম বেদ গোড়ায় ছিল নানা ঋষির নানা মন্ত্র, তাহার অর্থ এমন নয় যে প্রত্যেক সাধক ঋষি আপন আপন উপলব্ধি একান্ত ব্যক্তিগতভাবেই যদৃচ্ছা কহিয়া গিয়াছেন, কাহারও কথার সহিত কাহারও সম্বন্ধ বা মিল নাই। তাহা নয়। প্রাচীন ঋষিদিগের সাধনার একটা বিশেষত্বই এই যে তাহা একান্ত ব্যক্তিগত জিনিষ ছিল না। তাঁহাদের সাধনা চলিত একটা দল বা সঙ্ঘ বাঁধিয়া,-- বৈদিক ঋষির মুখে সর্ব্বদাই তাই শুনি বহুবচন—আমরা, তোমরা, সখাবৃন্দ ইত্যাদি—এই রকমে সঙ্ঘে সঙ্ঘে এক একটা সাধনার ক্রম দেখা দিয়াছে। সঙ্ঘ ছিল কোথাও গুরুশিষ্যের পরম্পরা, কোথাও বা তাহা ছিল একটা বংশ বা কুলের ধারা। এই যে নানা পারম্পর্য্যে, নানা ধারায়, নানা সাধক মন্ত্র সব সৃষ্টি করিয়াছেন বা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, তাহা লইয়াই ক্রমে বেদের অসংখ্য অফুরন্ত শাখা প্রতিশাখা উপশাখা সব গড়িয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমানে যে বেদ পাই তাহা এইরূপ কয়েকটি শাখা ও উপশাখার কয়েকটি অংশমাত্র। বেশীর ভাগ বেদই লোপ পাইয়াছে। সুতরাং বেদের মৌলিক সংগ্রহ বা শ্রেণীবিভাগ আপনা হইতেই এই রকমে কুলানুক্রমে বা গুরুশিষ্য পারম্পর্য্যে ঘটিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু তারপর প্রধান সংগ্রহ কার্য্য ও শ্রেণীবিভাগ হয় যখন সমস্ত প্রাপ্ত বেদরাজীকে তিনভাগে ভাগ করিয়া সাজান হইয়াছিল। সেই জন্যই বেদের আর এক নাম হইয়াছিল 'ত্রয়ী'। ঋক্, সাম ও যজু এই তিন পর্য্যায়ে তিন ধরণের মন্ত্রসমষ্টি সংগ্রথিত করা হয়। ঋকে পদ্য, সামে গীতিপদ্য (অর্থাৎ যে পদ্য গেয়), আর যজুতে গদ্যভাগ সন্নিবিষ্ট। বেদের সর্ব্বশেষ সংগ্রহ বা সংস্করণ হইল, যখন ঋক্ সাম যজু এই ত্রয়ীর সহিত অথর্ব্ব নামে আর এক পর্য্যায় যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। যে সব মন্ত্র পূর্ব্বসংগৃহীত ত্রয়ীর মধ্যে স্থান পায় নাই, যাহা ছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা পরে রচিত হইয়াছিল, সেই সকল লইয়াই অথর্ব্ববেদ। এই রকমে বেদের চারিভাগ বা চতুর্ব্বেদ গড়িয়া উঠিল।

পুরাণ বলিতেছেন যে, বেদ-মন্ত্রের যাঁহারা এই সংগ্রহের কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদের সাধারণ নাম বেদব্যাস। আটাশ জন বেদব্যাস যুগে যুগে এই রকম সংস্করণের পর সংস্করণ তৈয়ার করিয়া বেদের আধুনিক রূপ দিয়াছেন। সর্ব্বশেষ বেদব্যাস, যাঁহার হাতে বেদ চতুর্ব্বেদ হইল, তিনি মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। আর ভবিষ্যতেও নাকি বেদের আবার নূতন বিভাগ বা সংস্করণ হইবে এবং যে ব্যাসদেব সে কার্য্য করিবেন, তাঁহার নাম দ্রৌণিব্যাস।

সমগ্র বেদের এই যে তিন বা চারিভাগ করা হইয়াছে, তাহা কি কেবল বাহিরের গড়ন প্রভৃতি দেখিয়া ? বলা যায় না কি তাহা ছাড়া

সাধনার এক একটা বিশেষ ভঙ্গী, গোষ্ঠিগত ক্রিয়াকলাপের ধরণ মোটামুটি এই চারিটি ধারায় ব্যক্ত করা হইয়াছে? প্রাচীনতম বেদমন্ত্রে 'ঋক্', 'সাম' (তৎসঙ্গে স্তোম, উক্থ, গীঃ, ব্রহ্ম প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে) কথা দুইটির ছিল যে তাত্ত্বিক অর্থ, অন্তরে এক একটা বিশেষ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সংজ্ঞারূপে যে তাহারা ব্যবহৃত হইত, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। তারপর উপনিষৎও যখন বলিতেছেন শুনি, "অগ্নের্ঋচঃ বায়োর্যজুংষি, সামানি আদিত্যাৎ"—তখন কি এই ধরণের একটা কিছু বুঝায় না যে, যাঁহারা অগ্নির সাধক তাঁহাদের ছিল ঋক্‌মন্ত্র, যাঁহারা বায়ুর সাধক তাঁহাদের ছিল যজুঃমন্ত্র আর যাঁহারা আদিত্যের সাধনা করিতেন তাঁহাদের ছিল সামমন্ত্র? এই এক একটি সাধনপথের বিশেষত্ব কি, অগ্নি বায়ু আদিত্য এই সব রূপক বা প্রতীকের অর্থ কি, তাহা আর আমরা এখানে আলোচনা করিব না। বেদের বিভাগ সাধনপথের বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে কি না, সেই সমস্যাটি তুলিয়াই আমরা নিরস্ত হইব।

সে যাহা হউক, বেদ যেমন চারিভাগে বিভক্ত, তেমনি প্রত্যেক বেদও আবার কয়েকটি অংশে বা পর্ব্বে বিভক্ত। প্রথমে প্রত্যেক বেদের আছে মোটামুটি দুইটি প্রধান অংশ, এক 'সংহিতা', আর এক 'ব্রাহ্মণ'। সংহিতা হইতেছে মন্ত্রসমষ্টি, মূল বেদ। ব্রাহ্মণ এই মূল মন্ত্রেরই ভাষ্য, ব্যাখ্যা বা নূতন সংস্করণ। ব্রাহ্মণে আবার পাই তিনটি ভাগ—আসল ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ। বৈদিক সাধনার যে সব সাধারণ অনুভূতি উপলব্ধি, দেবতাদিগকে পূজা করিবার, প্রকাশ করিবার জন্য যে সব মন্ত্র, তাহা লইয়া সংহিতা। আর সে সকলের মধ্যে যে অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপ যাগযজ্ঞাদির উল্লেখ আছে, তাহাদের বর্ণনা

এবং বেদের অঙ্গ-পরিচয়—যথা, ঋষি, মন্ত্রসংখ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবরণ দিতেছে ব্রাহ্মণ। উপনিষদ্ হইতেছে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা, বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক রূপক যথাসম্ভব পরিহার করিয়া শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের কথা। সংহিতা অধ্যাত্মবিদ্যার রূপের দিকে জোর দিয়াছে, আর উপনিষদ্ দিয়াছে অধ্যাত্মবিদ্যার স্বরূপের দিকে। আরণ্যক হইতেছে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের সংমিশ্রণ। তবে দাঁড়াইল এই যে, বেদের প্রথমভাগ সংহিতা, সংহিতার পরে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের শেষভাগে আরণ্যক ও আরণ্যকের শেষভাগে বেদের পরিশিষ্ট উপনিষদ্ বা বেদান্ত। কোথাও অবশ্য দেখি আরণ্যক হইতেছে ব্রাহ্মণেরই নামান্তর (যেমন "ঐতরেয় আরণ্যক"—এইখানেই আছে ঋগ্বেদ সংহিতার পরিচয়), আবার কোথাও বা আরণ্যকের অর্থ উপনিষদ্ (যেমন বৃহদারণ্যকোপনিষদ্)।

প্রত্যেক বেদের এই যে চারি পর্য্যায়, সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে তাহা নির্ণীত হইয়াছে আশ্রম বিভাগ অনুসারে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে যখন স্বাধ্যায়ই জীবনের ব্রত, তখন মন্ত্রভাগের উপর জোর দেওয়া হইত বেশী, কারণ উহাই সকল জ্ঞানের মূল প্রতিষ্ঠা, উহারই মধ্যে রহিয়াছে জীবনের আদর্শের বনিয়াদ, মূল সূত্র। তারপর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া যে সব বৈদিক আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়াদি করিতে হইত, তাহা লইয়া ব্রাহ্মণ। তারপর বানপ্রস্থে যখন বাহ্য কর্ম্মানুষ্ঠান সকল সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিত, তাহাদের মানসিক প্রতিরূপের সাধনা চলিত, সেই অরণ্যবাসের সময় আরণ্যকের সৃষ্টি ও চর্চ্চা। সর্ব্বশেষে চতুর্থ বা যতি আশ্রমে যখন কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া, মানসিক রূপকাদিকেও ছাড়াইয়া—নৈষা তর্কেণ মতিরাপনীয়া—ধ্যান ধারণা সমাধির দ্বারা চরম

সত্য, শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইত, তখনই উপনিষদের উদ্ভব ও আলোচনা।

কিন্তু তা ছাড়া, সময়ের সাথে সাথে বৈদিক সাধনার যে ক্রম-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহারই মোটামুটি কয়েকটি ধাপ নির্দ্দেশ করিতেছে এই পর্য্যায় বিভাগ, এ কথাও বলা যাইতে পারে। আরণ্যক অর্থ কোথাও ব্রাহ্মণ, কোথাও উপনিষদ্, তাই বৈদিক সাধনাকে যুগ হিসাবে তিনটি স্তরে আমরা ফেলিতে পারি—(১) সংহিতা (২) ব্রাহ্মণ (৩) উপনিষদ্। সংহিতার সাধনা হইতেছে দেবত্ব লাভ। দেবতা হইতেছে, বিশ্বাতিরিক্ত যে অনন্ত অখণ্ড সত্তা জ্ঞান আনন্দ তাহার বিশ্বব্যাপী (cosmic) এক একটি প্রকাশ-ধারা। আধারের প্রতি স্তরের, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাকৃত রূপ শুদ্ধ স্বচ্ছ করিয়া তাহাদের মধ্যে বিশ্বদেবতার স্বরূপের লীলা ফুটাইয়া তোলাই হইতেছে দেবজন্ম বা দিব্যজন্ম। এই সাধনার যে সব ক্রিয়া তাহাদিগকে বাহ্যরূপ দিয়া দৃঢ় অনুষ্ঠানে বাঁধিয়া তোলাই হইতেছে ব্রাহ্মণের সাধনা। আর উপনিষদের সাধনা হইতেছে দেবতাদের প্রকাশ ততখানি নয়, কিন্তু দেবতাদের যে মূল দেবসত্তা তাহার মধ্যে ডুবিয়া যাওয়া, আধারের অঙ্গে অঙ্গে দেবশক্তির অবতরণ ততখানি নয়, কিন্তু আধারের যাহা মূল কেন্দ্র, যাহাকে বলা হইয়াছে "অঙ্গুষ্ঠমাত্রোঽয়ং পুরুষঃ সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"—সেই হৃদয়-পুরুষকে আধারের উপরে যে মহান্ পুরুষ তাহার সহিত মিলাইয়া দেওয়া; বিশ্বের মধ্যে দেবতার প্রকাশের পূর্ব্বে,চাই বিশ্বাতিরিক্ত, দেবতাদের যে চরম সত্য ও একত্ব তাহাকে উপলব্ধি করা।

কিন্তু যুগভেদে একের পর আর একটি এই তিনটি সাধনার উদ্ভব

হইয়াছে—মোটামুটি এ কথা সত্য হইলেও, আসলে ঐ তিনটি ধারাকে এ রকম কাঁটাছাটা ভাবে দেখা বোধ হয় ঠিক নয়। অনেক উপনিষদ্ অনেক ব্রাহ্মণের অপেক্ষা পুরাতন এবং সংহিতার কোন কোন অংশ কোন কোন ব্রাহ্মণের বা উপনিষদের অপেক্ষা অর্ব্বাচীন। ব্যাপারটি তাই আমরা দেখিতে চাই এই ভাবে, প্রথমে ছিল সংহিতা অর্থাৎ সংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রভাগ, তারপর সংহিতা দুইটি ধারায় পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, (১) ব্রাহ্মণ ও (২) উপনিষদ্। ব্রাহ্মণে সংহিতার যে বাহন ক্রিয়াকাণ্ড তাহারই উপর জোর দিয়াছে, আর উপনিষদ্ ভিতরের একেবারে গোড়াকার যে মূল তত্ত্ব জ্ঞান তাহা লইয়াই ব্যাপৃত হইয়াছে। অবশ্য উত্তরকালে সংহিতার বাহ্য দিকটাই লোকের চোখে পড়িয়াছে, ব্রাহ্মণেই বেদের ব্যাখ্যার ভার লইয়াছেন, এই জন্য। কিন্তু উপনিষদ বেদের যে মূল আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তাহারই ধারা অক্ষুন্ন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। এইজন্যই উপনিষদকে বলা হয় বেদের 'জ্ঞানকাণ্ড', আর সংহিতা ও ব্রাহ্মণের নাম দেওয়া হয় 'কর্ম্মকাণ্ড'।

সকল বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ এবং ঋগ্বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ সংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন (তবে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যেমন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন হয়ত দশম মণ্ডলটি কিছু পরবর্ত্তী কালের)। শুধু তাই নয়, অন্যান্য সংহিতার মধ্যে ঋগ্বেদের বহু শ্লোক, শ্লোকের পর শ্লোক হুবহু বা যৎসামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া তুলিয়া লওয়া হইয়াছে দেখা যায়। এবিষয়ে সামবেদই ঋগ্বেদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। সামবেদ নূতন করিয়া সাজান ঋগ্বেদেরই সংস্করণ, এরকম বলিলে খুব অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য মতান্তরে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে ঋগ্বেদ অপেক্ষা সামবেদই প্রাচীনতর—সামবেদ সংহিতাই প্রাচীনতম মূল সংহিতা।

ঋগ্বেদ সংহিতাকেও ভাগে ভাগে ভাগ করিয়া সাজান হইয়াছে—আধুনিক গ্রন্থসমূহে যে রকম খণ্ড, পরিচ্ছেদ ইত্যাদি থাকে, সেই রকম এই যে শৃঙ্খলা ইহার আছে দুইটি পদ্ধতি। প্রথম, সমস্ত সংহিতাকে দশটি খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে, প্রত্যেক খণ্ডকে বলা হয় মণ্ডল। তারপর প্রত্যেক মণ্ডল গুচ্ছে গুচ্ছে সজ্জিত শ্লোকমালায় বিভক্ত। এক একটি শ্লোকগুচ্ছ হইতেছে এক একটি 'সূক্ত'। প্রত্যেক শ্লোকের বা মন্ত্রের নাম 'ঋক্'। ঋগ্বেদের মণ্ডল বিভাগ হইয়াছে মোটমুটি এক এক ঋষি ধরিয়া, যেমন দ্বিতীয় মণ্ডল হইতেছে গৃৎসমদ ও তদ্‌বংশীয় ঋষিদের, তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি বিশ্বামিত্র, চতুর্থ মণ্ডলের বামদেব, পঞ্চম মণ্ডলের অত্রি, ষষ্ঠ মণ্ডলের ভরদ্বাজ, সপ্তম মণ্ডলের বশিষ্ঠ, অষ্টম মণ্ডলের প্রগাথা। সমগ্র নবম মণ্ডল হইতেছে শুধু সোমদেবতার উদ্দেশ্যে। প্রথম ও দশম মণ্ডলে নানা ঋষি দেখিতে পাই। এক একটি সূক্ত এক একটি বিশেষ দেবতা বা সেই দেবতার সহিত সংশ্লিষ্ট একাধিক দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্রাবলী। ঋগ্বেদ বিভাগের এই রকম পদ্ধতি ছাড়া আর একটি পদ্ধতি আছে। সমস্ত সংহিতাকে আটভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক খণ্ডের নাম এক একটি অষ্টক। প্রত্যেক অষ্টক আবার অধ্যায়, অনুবাক্, বর্গে বিভক্ত। কিন্তু কি লক্ষণ অনুসারে এই বিভাগ করা হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন।

সে যাহা হউক, বেদের বহিরের পরিচয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য বেদের অন্তরের পরিচয় দেওয়া। এতকাল বেদ প্রত্নতাত্ত্বিকেরই গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বেদের আছে একটা জীবন্ত সত্তা, যে দেশে যে কালে হউক না কেন, মানুষকে একটা বৃহত্তর জীবনে উঠিয়া দাঁড়াইবার লক্ষ্য ও সাধনা যে বেদ

দিতেছে, তাহাই বেদের আসল পরিচয়। অজ্ঞানের অশক্তির নিরানন্দের কবলগত মানুষ চিরকাল যে স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছে, সকল বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া যে মহান্ আদর্শের পিছনে সে ছুটিয়া চলিয়াছে—"যাহাতে আমি অমৃতত্ব পাইব না, তাহা দিয়া আমি কি করিব ?"—মানুষের অন্তরাত্মার এই যে অমৃতত্ব-পিপাসা, তাহার পূর্ণ তৃপ্তি যেখানে ও যাহা দিয়া, সেই রসের বৃহৎ আধার—রায়ো অবনিঃ—সেই মহান্ অর্ণব—মহো অর্ণঃ—হইতেছে বেদ। বেদমন্ত্রে যাহার অন্তরে এই দিব্যতৃষ্ণা জাগিয়া উঠে, তাহারই বেদপাঠ সার্থক।

ঋষি

মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা

ঋগ্বেদ

প্রথম মণ্ডল—প্রথম সূক্ত হইতে দশম সূক্ত

প্রথমং সূক্তং

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমং ॥ ১ ॥

অগ্নিং (অগ্নিকে, চিন্ময় তপঃশক্তিকে) ঈলে (আমি বন্দনা, পূজা করিতেছি), [যিনি] যজ্ঞস্য (যজ্ঞের) পুরোহিতং (পুরঃ+হিতং, পুরোভাগে স্থাপিত), দেবং (দেবতা বা দিব্য, জ্যোতির্ময়) ঋত্বিজং (ঋত্বিক, যিনি যথা ঋতু অর্থাৎ, ঋত বা সত্যের ছন্দ বা ধর্ম্ম অনুসারে যাজন করেন), হোতারং (হোতা, যিনি আহ্বান করেন—অন্যান্য দেবতাকে) রত্ন-ধা-তমং (যিনি আনন্দসম্পদকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন)।

অগ্নিঃ পূর্বেভি ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃ (পূর্ব্ব পূর্ব্ব) ঋষিভিঃ (ঋষিদিগের দ্বারা) ঈড্যঃ (বন্দনীয়), উত (এবং) নূতনৈঃ (নূতন নূতন দিগের দ্বারাও)। সঃ (তিনি) দেবান্ (দেবতা সকলকে) ইহ (এখানে) আ বক্ষতি (বহিয়া আনিবেন)। এহ = আ + ইহ।

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে।
যশসং বীরবত্তমং ॥ ৩ ॥

অগ্নিনা (অগ্নির সহায়ে) [লোকে] অশ্নবৎ (লাভ করে) দিবে দিবে (দিনে দিনে) পোষং এব (পুষ্টিই পাইতেছে যে), বীর-বৎ-তমং (বীরত্ব-পূর্ণ, সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যশালী), যশসং ('যশস্বী', বিজয়ী) রয়িং (পূর্ণ সার্থকতার আনন্দ)।

প্রথম সূক্ত

অগ্নির পূজা আমি করিতেছি। যজ্ঞের সম্মুখে আসীন এই সে পুরোহিত, দিব্য ঋত্বিক, সেই হোতা, পূর্ণ-আনন্দের প্রতিষ্ঠাতা ॥ ১ ॥

অগ্নিকে পূর্ব্বতন ঋষিবৃন্দ পূজা করিয়া চলিতেন, নূতন ঋষিরাও অগ্নিকেই পূজা করিয়া চলিবে। এই অগ্নিশক্তিই সকল দেবতাকে এখানে বহিয়া আনিবে ॥ ২ ॥

তপঃ-অগ্নির সহায়ে আমরা লাভ করিব সেই সার্থকতা যাহা প্রতিদিনের আলোকে পুষ্টই হইয়া চলিয়াছে, যাহা জয়শ্রীমণ্ডিত, যাহাতেই পূর্ণ বীর্য্য॥ ৩ ॥

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি :
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অগ্নে (হে অগ্নি), যং (যে) অধ্বরং (সচল, পথ বাহিয়া ক্রমে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে যাহা সেই) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) বিশ্বতঃ (চারিদিক হইতে) পরিভূঃ (ঘিরিয়া সপ্রাত) অসি (হইতেছ), সঃ ইৎ (তাহাই) দেবেষু (দেবতাদিগের মধ্যে) গচ্ছতি (গিয়া পৌঁছিতেছে)।

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ ।
দেবোদেবেভিরাগমৎ ॥ ৫ ॥

অগ্নিঃ [হইতেছেন] হোতা, কবিক্রতুঃ (দ্রষ্টার বা দৃষ্টিময় ক্রিয়াশক্তি, চিন্ময় তপঃশক্তি) সত্যঃ, চিত্র-শ্রব-তমঃ (বিচিত্র দিব্যশ্রবণে পরিপূর্ণ, যিনি জ্ঞানের যাবতীয় বিচিত্র বাণী শুনিতেছেন)। [তিনি স্বয়ং] দেবঃ (দেবতা, দিব্যশক্তি), দেবেভিঃ (দেবতাদিগের সহিত) আগমৎ (আসুন, যেন আসেন)।

যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি ।
তবেত্তৎসত্যমঙ্গিরঃ ॥ ৬ ॥

অঙ্গ (নিশ্চয়ই হে) অগ্নে (অগ্নি), ত্বং (তুমি) দাশুষে (দানশীলের, সমর্পণ বা উৎসর্গপরায়ণ যজমান বা সাধকের জন্য) যৎ (যে) ভদ্রং (শ্রেয়, কল্যাণ) করিষ্যসি (করিবে, গড়িয়া তুলিবে), [তাহা] তব ইৎ (তোমারই আপনার), অঙ্গিরঃ (হে অঙ্গিরা ঋষিদিগের ইষ্টদেব!), তৎসত্যং (সেই-সত্য, সেই উত্তম সত্য)।

হে তপঃশক্তি! যে যজ্ঞ-যাত্রা ঘিরিয়া তুমি মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছ, সেই যজ্ঞই চলিয়াছে সকল দেবশক্তির সমীপে ॥ ৪॥

অগ্নি আবাহন-শক্তি, অগ্নি দৃষ্টিময় কর্ম্মশক্তি। অগ্নিই সত্য, অগ্নির দিব্যশ্রবণে বিচিত্র জ্ঞান পূর্ণ-প্রকটিত। অগ্নি দেবতা, দেবতাবৃন্দকে সঙ্গে করিয়া যেন আসেন তিনি এখানে ॥ ৫ ॥

হে অগ্নি! প্রদাতার জন্য যে শ্রেয় তুমি গড়িয়া তুলিবে, হে তপোদেবতা! তাহা হইতেছে তোমারই আপনার সেই-সত্য ॥ ৬ ॥

উপত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং।
নমো ভরন্ত এমসি ॥ ৭ ॥

অগ্নে (হে অগ্নি), বয়ং (আমরা) দিবে দিবে (দিনে দিনে, প্রত্যহ) দোষা বস্তঃ (রাত্রিতে দিবসে—অজ্ঞানের অবস্থায় হউক বা জ্ঞানের অবস্থায় হউক) ধিয়া (বিশুদ্ধ বুদ্ধির সহায়ে) নমঃ (প্রণতি, সমর্পণ) ভরন্তঃ (বহিয়া লইয়া) ত্বা (তোমার) উপ (সমীপে) এমসি (আসিয়া উপস্থিত হইতেছি)। এমসি = আ + ইমসি।

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং।
বর্দ্ধমানং স্বে দমে ॥ ৮ ॥

[যে তুমি] অধ্বরাণাং (ক্রম অনুসারী যজ্ঞ সকলের) রাজন্তং (জ্যোতির্ময় রাজা), ঋতস্য (সত্যধর্ম্মের) দীদিবিং (প্রদীপ্ত) গোপাং (রক্ষক), স্বে (নিজের) দমে (ভবনে, লোকে, প্রতিষ্ঠানে) বর্দ্ধমানং (ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু) [সেই—উপ ত্বা এমসি]।

স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯ ॥

সঃ (সেই তুমি বা তাই) অগ্নে, সূনবে (পুত্রের জন্যে) পিতা ইব (পিতার মত) নঃ (আমাদের পক্ষে) সূপায়নঃ (সু + উপ + অয়নঃ—সহজে উপগম্য, সুখলভ্য) ভব (হও)। নঃ (আমাদের) স্বস্তয়ে (সু + অস্তি—কল্যাণময় প্রতিষ্ঠার জন্য) [আমাদিগের সহিত] সচস্ব (সংযুক্ত হইয়া থাক)।

হে অগ্নি! তোমারই কাছে আমরা দিনের পর দিনে আলোকে আঁধারে, বিশুদ্ধ বুদ্ধির সহায়ে আমাদের প্রণতি বহিয়া চলিয়াছি ॥ ৭ ॥

সচল যজ্ঞসকলের অধিষ্ঠাতা তুমি, তুমি সত্য ধর্ম্মের জ্যোতির্ম্ময় রক্ষক, তুমি আপন প্রতিষ্ঠানে উপচিত হইয়া চলিয়াছ ॥ ৮ ॥

তাই, হে অগ্নিদেব! পিতার মত তুমি তোমার এই সন্তানদের জন্য সুখ-উপগম্য হও। কল্যাণ-প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য আমাদিগকে দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরিয়া রাখ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য

বিশ্বসৃষ্টি এক বিরাট যজ্ঞ। সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং (গীতা)। সকল বস্তুই এই যজ্ঞে আপনাকে আহুতি প্রদান করিতেছে। কেন? যজ্ঞ হইতেছে গতি, অর্থাৎ ক্রমবিকাশের পূর্ণতার সার্থকতার দিকে নিত্য প্রবহমান ধারা। যজ্ঞ নিষ্পাদিত হইতেছে, সৃষ্টি সচল হইয়াছে, সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, সৃষ্টির অন্তর্গত পদার্থের আত্মাহুতির দ্বারা। আপনাকে আহুতি দিয়া, একে অপরকে সৃষ্টি করিতেছে ও তাহার মধ্যে আপনার বৃহত্তর সত্তা পাইতেছে। জড় হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে প্রাণী, প্রাণী হইতে মানুষ ফুটিয়া উঠিয়াছে—এবং মানুষ হইতে দেবতা ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে, এই রকম ক্রমিক আত্মবলির কল্যাণে। মেঘ আপনাকে বলি দিয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হইতেছে, পিতা আপনার রক্তমাংস দিয়া পুত্রকে জন্ম দিতেছে—এ সকলও যজ্ঞেরই নানা মূর্ত্তি।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃসৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥—(গীতা)

এই যজ্ঞ বা সৃষ্টিচক্রকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে যে সব মূলশক্তি, তাহারাই দেবতা। আপনাকে উৎসর্গ করিয়া জীব দেবধর্ম্মই পালন করিতেছে।

বাহিরে চলিয়াছে যে ভূতযজ্ঞ, মানুষের অন্তরে তাহাই হইতেছে যোগযজ্ঞ। মানুষের জীবনসাধনাও একটা যজ্ঞ। সাধনার লক্ষ্য কি? ক্রমোন্নতি, ঊর্দ্ধগতি—অল্প হইতে বৃহতের দিকে, স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে; দেহ হইতে দেহাধিপতির দিকে,—দুঃখ, অশক্তি, অজ্ঞান হইতে আনন্দ, শক্তি, জ্ঞানের দিকে বাহিয়া চলা। কি রকমে উহা সম্ভব? সেই একই আত্মবলি—উৎসর্গ, নিবেদন, 'নমঃ' দ্বারা। আমার মধ্যে যে নীচের নীচের স্তর, নীচের নীচের ধর্ম্ম সে সকলকে ক্রমে উপরে উপরের স্তরের ও ধর্ম্মের নিকটে শান্ত করিয়া ধরিয়া দিতে হইবে। তাই কঠোপনিষদ্ বলিতেছে—

যচ্ছেৎ বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ যচ্ছেৎ জ্ঞানমাত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিয়চ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেৎ শান্তমাত্মনি॥

গীতাও বলিতেছেন—

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযম যোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥

আমার ভিতরে উপরের যে উপরিতম শক্তিসঙ্ঘ তাহারই নাম দেবতা। সাধক এই দেবশক্তির কাছে আপনাকে ঢালিয়া দিবে—নমঃ বহিয়া আনিবে, তবেই দেবতা তাহার মধ্যে নামিয়া আসিয়া তাহার আধার দেব-ঐশ্বর্য্যে ভরিয়া তুলিবে। সাধক দেবশক্তিকে আপনার মধ্যে জন্ম দিতেছে, দেবশক্তিও মানুষকে আপনার মধ্যে তুলিয়া ধরিতেছে। এই যজ্ঞরহস্যকেই লক্ষ্য করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ স্যথ॥

এই যে যজ্ঞ—জীবনের ক্রমিক উন্নতি, ঊর্দ্ধগতি—ইহার সম্মুখভাগে তোরণে রহিয়াছে যে দুয়ারী তিনিই অগ্নি অর্থাৎ তপঃশক্তি। তপঃ-শক্তিকে সম্মুখে করিয়া, ইহারই সহায়ে সাধক সাধনার পথে—অধ্বর যজ্ঞে আগুয়ান। অগ্নি, যজ্ঞের তাই পুরোহিত। এই তপঃশক্তিরই মধ্যে সাধক তাহার আধারের প্রতি অঙ্গ আহুতি দিতেছে, এই তপঃশক্তিই সাধকের আত্মনিবেদন দেবতার কাছে পৌছাইয়া দিতেছে, দেবতাকে সাধকের আধারে আহ্বান করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেছে, তাই অগ্নি হোতা। অগ্নির আর এক নাম বহ্নি—এইজন্যই—কারণ তিনি সকল দিব্যশক্তিকে সাধকের মধ্যে বহিয়া আনিতেছেন, এবং সাধককে দিব্য শক্তিসঙ্ঘের মধ্যে বহিয়া লইয়া চলিয়াছেন। এই কাজ অগ্নি করিতেছে সত্যের অটুট ছন্দে, দিনে দিনে ক্রমিক পরিস্ফুরণে, তাই তিনি ঋত্বিক। ঋত্বিক সেই—যে জানে কোন্ ঋতুতে কখন কিরূপ যজ্ঞ করিতে হয়। তপঃশক্তিও জানে সাধকের মধ্যে সত্যপ্রেরণার বলে সাধনা কখন, কোন্ পথে, কি ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। তপঃশক্তির আগুণ সাধকের আধারকে পোড়াইয়া শুদ্ধ সমর্থ করিয়া তুলিতেছে, তাহার মধ্যে আনিয়া দিতেছে, দিব্যশক্তি (যশসং বীরবত্তমং), দিব্যজ্ঞান (চিত্রশ্রবস্তমং) আর দিব্য আনন্দ (রত্নধাতমং)—পরিপূর্ণ সার্থকতা (তৎসত্যং, ভদ্রং, রয়িং)। অগ্নির যে শক্তি তাহা হইতেছে দিব্যদৃষ্টির স্বভাবজ ক্রিয়াশক্তি, সাক্ষাৎজ্ঞানের কর্ম্মসামর্থ্য (কবিক্রতু), তাই তিনি মূর্ত্ত সত্যধর্ম্ম (গোপাং ঋতস্য)। এই সত্যের, ঋতের, বৃহতের যে প্রতিষ্ঠান, যে তুরীয় লোক, তাহারই নাম স্বর্লোক, তাহাই অগ্নির—সকল দেবতা-দিগের 'স্ব দম' নিজের গৃহ। এখানেই সকল দেবতা স্বরূপে ও স্বভাবে উদ্ভাসিত। তবে প্রত্যেক দেবতার আছে ইহলোকে—ব্যক্ত আধারে এক একটা বিশেষ লীলাভূমি। অগ্নির আসন, কর্ম্মক্ষেত্র

হইতেছে পৃথিবী, স্থূলশরীর। তপঃশক্তি সাধককে আশ্রয় করে প্রথমে তাহার শারীরচেতনায়, ক্রমে তাহাকে অন্যান্য দেবতার সহায়ে শরীর হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে, মন হইতে অতিমানসে, তুরীয় স্বর্লোকে লইয়া চলে। প্রত্যেক দেবতা এক একটি বিশেষ স্তরের বিশেষ ধর্ম্মের দিব্যমূর্ত্তি এবং সকলে একই দেবশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। কিন্তু সকল দেবতার আগে অগ্নি, এবং সাধককে সাধনার পথে প্রবেশ করিতে হইলে, অগ্রসর হইতে হইলে, হইতে হইবে 'অঙ্গিরা' বা অগ্নিসাধক।

বর্ত্তমান সূক্তকে (সূক্ত অর্থ "সু উক্ত" নির্দ্দোষ উক্তি, সিদ্ধবাণী) চিন্তার ধারা অনুসারে তিনটি তিনটি ঋক্ করিয়া তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম তিনটিতে বলা হইয়াছে অগ্নি কে, ইহার পরিচয়, নামরূপ। দ্বিতীয় তিনটিতে বলা হইয়াছে, অগ্নি কি,—ইহার গুণ, প্রকৃতি, স্বভাব। আর তৃতীয় তিনটীতে বলা হইয়াছে, সাধন-যজ্ঞে সাধকের সহিত অগ্নির সম্বন্ধ কি। মন্ত্রটি গায়ত্রী ছন্দে রচিত—গায়ত্রী ছন্দেও আছে তিনটি পদ—সুতরাং প্রতি ঋকেও আমরা দেখিতেছি ছন্দ হিসাবে আছে তিনটি করিয়া ভাগ।

দ্বিতীয়ং সূক্তং

বায়বা য়াহি দর্শতেমে সোমা অরংকৃতাঃ।
তেষাং পাহি শ্রুধী হবং ॥ ১ ॥

দর্শত (দৃষ্টিযুক্ত), বায়ো (হে বায়ু!) আ য়াহি (এস এখানে), ইমে (এই) সোমাঃ (সোম সকল) অরং কৃতাঃ (প্রস্তুত হইয়াছে, চালিত বা সচল করা হইয়াছে—অর্—করা, চলা)। তেষাং (তাহাদিগের বা তাহাদিগের হইতে অর্থাৎ তাহাদিগকে) পাহি (পান কর), [আমাদের] হবং (আহ্বান) শ্রুধী (শ্রবণ কর)।

বায় উক্‌থেভি র্জরন্তে ত্বামচ্ছা জরিতারঃ।
সুতসোমা অহর্বিদঃ ॥ ২ ॥

বায়ো (হে বায়ু), সুত সোমাঃ (যাহারা সোমরস নিংড়াইয়া, পিষিয়া বাহির করিয়াছে), অহর্বিদঃ (যাহারা দিবসকে লাভ করিয়াছে—অহন্ + বিদ্) [সেই] জরিতারঃ (প্রণয়ী, পূজারী সকলে) উক্‌থেভিঃ (উক্‌থ অর্থাৎ যে বাক্ বা মন্ত্র সত্যকে প্রকাশ করিয়া ফুটাইয়া ধরে তাহার সহায়ে) ত্বাং (তোমার) অচ্ছা (প্রতি, উদ্দেশ্যে) জরন্তে (পূজা দিতেছে)।

বায়ো তব প্রপৃঞ্চতী ধেনা জিগাতি দাশুষে।
উরূচী সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥

বায়ো! তব (তোমার) প্রপৃঞ্চতী (পূর্ণকারিণী, প্লাবিনী) ধেনা (ধারা) সোমপীতয়ে (সোমরস পান করিবার জন্য) উরূচী (বিস্তীর্ণ হইয়া) দাশুষে (দাতার উদ্দেশ্যে) জিগাতি (চলিয়াছে)।

দ্বিতীয় সূক্ত

জ্ঞানের দৃষ্টি লইয়া, এস হে প্রাণশক্তি! শুদ্ধ আনন্দের ধারা এই যে সব সাজাইয়া বহাইয়া দিয়াছি। পান কর তাহা, শোন আমাদের আহ্বান ॥ ১ ॥

হে বায়ু! যে মন্ত্রে তোমার প্রকাশ সেই মন্ত্রে তোমার উদ্দেশ্যে পূজা দিতেছে তোমার পূজারীবৃন্দ। সোমের রস তাহারা পিষিয়া বাহির করিয়াছে, দিনের আলো তাহারা খুঁজিয়া পাইয়াছে ॥ ২ ॥

হে বায়ুদেবতা! সর্ব্বস্ব যে অর্পণ করিতেছে তাহার সকলই পূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়াছে তোমার ধারা, চলিয়াছে প্রসারিত হইয়া সোমানন্দ পান করিতে ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা উপ প্রয়োভিরা গতং।
ইন্দবো বামুশন্তি হি ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রবায়ূ (হে ইন্দ্র ও বায়ু, দুজনা তোমরা), ইমে (এই সকল) সুতাঃ (রস প্রস্তুত হইয়াছে) ; প্রয়োভিঃ (সকল প্রেয় বা সুখ লইয়া) উপ (নিকটে) আগতং (এস)। হি (কারণ) ইন্দবঃ (তৃপ্তি সকল অথবা তৃপ্তি দেয় যাহারা তাহারা) বাং (তোমাদের দুজনাকে) উশন্তি (আকাঙ্ক্ষা করিতেছে)।

বায়বিন্দ্রশ্চ চেতথঃ সুতানাং বাজিনীবসূ।
তাবা য়াতমুপদ্রবৎ ॥ ৫ ॥

বায়ো ইন্দ্রঃ চ, (হে বায়ু ! হে ইন্দ্র, তুমিও !) সুতানাং (রস সকলের) চেতথ (জ্ঞান লইয়া জাগ)। [হে] বাজিনী বসূ (বাজিনী বা বাজ, ঋদ্ধি যাহাদের বসু অর্থাৎ সার সম্পদ) তৌ (তাহারা দুইজনা) [তোমরা] দ্রবৎ (ধাইয়া, দ্রুত চলিয়া) উপ (নিকটে) আয়াতং (এস)।

বায়বিন্দ্রশ্চ সুন্বত আ য়াতমুপনিষ্কৃতং।
মক্ষিত্থা ধিয়া নরা ॥ ৬ ॥

বায়ো ইন্দ্রঃ চ, নরা (হে বীরদ্বয়—নৃ=পুরুষ দেবতা ; গ্না=দেবতার পত্নী বা শক্তি), ইৎথা ধিয়া (সত্য বুদ্ধির সহায়ে) মক্ষু (শীঘ্র, অবিলম্বে) সুন্বতঃ (রস প্রস্তুত করিয়াছে যে তাহার, সোমকারকের) নিষ্কৃতং (সম্যক প্রস্তুত) [রসের] উপ আয়াতং।

ইন্দ্র, বায়ু! এই যে রসায়ন প্রস্তুত। এস এখানে তোমরা তোমাদের প্রেয়রাজী লইয়া। তৃপ্তির যত ধারা তোমাদিগকেই আকাঙ্ক্ষা করিতেছে ॥ ৪ ॥

হে বায়ু! তুমিও, হে ইন্দ্র! জাগ সোমানন্দের জ্ঞানে। ঋদ্ধির সম্পদ তোমাদেরই। দ্রুতবেগে এস তবে এখানে ॥ ৫ ॥

হে বায়ু! হে ইন্দ্র! সোমের ভিয়ারী নির্দ্দোষভাবে সোম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। হে বীর যুগল! সত্যবুদ্ধি লইয়া এস তোমরা অবিলম্বে ॥ ৬ ॥

মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণঞ্চ রিশাদসং ।
ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা ॥ ৭ ॥

পূতদক্ষং (বিশুদ্ধ সত্য—নির্দ্দেশ যাহার সেই—গ্রীক 'doxa', লাতিন 'doceo') মিত্রং (মিত্রকে), চ (আর) রিশাদসম্ ('রিশ' অর্থাৎ আঘাতকারী বা আততায়ীকে যে ধ্বংস করে—দস্—সেই) বরুণং (বরুণকে) হুবে (আমি আহ্বান করি) । [তাহারা দুইজনা হইতেছে সেই] সাধন্তা (যাহারা গড়িতেছে) ঘৃতাচীং (তেজোঘন—ঘৃ উজ্জ্বল করা) ধিয়ং (বুদ্ধিকে) ।

ঋতেন মিত্রাবরুণৌ ঋতাবৃধৌ ঋতস্পৃশা ।
ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে ॥ ৮ ॥

ঋতেন (সত্যধর্ম্মের দ্বারা) ঋতাবৃধৌ (সত্যধর্ম্মকে বৃদ্ধি করিতেছে যাহারা) ঋতস্পৃশা (সত্যধর্ম্মকে স্পর্শ করিয়া আছে যাহারা) [সেই] মিত্রাবরুণৌ (মিত্র ও বরুণ) বৃহন্তং (বৃহৎ) ক্রতুং (তপঃ বা ক্রিয়াশক্তি) আশাথে (লাভ, উপভোগ করিতেছে) ।

কবী নো মিত্রাবরুণা তুবিজাতা উরুক্ষয়া ।
দক্ষং দধাতে অপসং ॥ ৯ ॥

কবী (সত্যদ্রষ্টা) তুবিজাতা (বহুরূপে জাত—তুবি—বহু), উরুক্ষয়া (বিপুলবিস্তৃত আবাস যাঁহাদের সেই) মিত্রাবরুণা (মিত্র ও বরুণ) নঃ (আমাদের) অপসং (কর্ম্মঠ কর্ম্মপর) দক্ষং (সত্যনির্দ্দেশ) দধাতে (ধরিয়া আছেন, স্থাপিত করিয়াছেন)।

মিত্রের বিশুদ্ধ ঈক্ষণ, তাঁহাকে ডাকিতেছি। বরুণ আততায়ীকে সংহার করেন, তাঁহাকেও ডাকিতেছি। উভয়ে তাঁহারা গড়িয়া তুলিতেছেন তেজোঘন বুদ্ধি ॥ ৭ ॥

হে মিত্র বরুণ! সত্যের ধর্ম্ম তোমরা স্পর্শ করিয়া আছ, সত্যের ধর্ম্ম তোমরা বৃদ্ধি করিতেছ, সেই সত্যের ধর্ম্মেরই বলে অধিকার কর তোমরা বৃহতের তপঃক্রিয়া ॥ ৮ ॥

মিত্রবরুণ আমাদের সত্যদ্রষ্টা। বহুল তাঁহাদের রূপ, বিশাল তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান। কর্ম্মে নিযুক্ত যে সত্যের স্থিরনির্দ্দেশ তাহা তাঁহারা ধরিয়া রহিয়াছেন ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য

সকল সাধনার মূলে, উৎসরূপে, গোড়াকার প্রেরণারূপে রহিয়াছে যে উর্দ্ধমুখী তেজ, যে চিন্ময় তপঃশক্তি, যে অগ্নিশক্তি—তাহারই উদ্বোধন করা হইয়াছে প্রথম সূক্তে। বর্ত্তমান সূক্তে বলা হইতেছে সেই উর্দ্ধমুখী সাধনার বিভিন্ন ক্রম বা সোপান।

বৈদিক সাধনার লক্ষ্য "সত্যং ঋতং বৃহৎ"। মানুষের সাধারণ জীবন হইতেছে দেহ, প্রাণ আর মন লইয়া। দেহের ক্ষুদ্র কর্ম্ম, প্রাণের ক্ষুদ্র প্রেরণা ও ভোগ, মনের ক্ষুদ্র জ্ঞান—ইহার বেশী মানুষ জানে না, ধরিতে পারে না। কিন্তু দেহ প্রাণ মনের উপরে আছে একটা

বৃহতের প্রতিষ্ঠান যেখানে উঠিতে পারিলে মানুষ পায় তাহার সত্যপূর্ণ সত্তা, সত্যপূর্ণ কর্ম্ম অর্থাৎ দেবতার স্বভাব ও স্বধর্ম্ম, দিব্যজন্ম। দেবতাদের প্রতিষ্ঠান এই স্বর্লোকে পৌছিবার অন্তরায় দেহ, প্রাণ, মন। কিন্তু তার অর্থ এমন নয় যে এই দেহ প্রাণ মনকে মায়াবাদীর মত অস্বীকার করিতে হইবে বা ধ্বংস করিতে হইবে। না, ইহাদিগকে কেবল শুদ্ধ ও সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। আধারের এই শুদ্ধি ও সিদ্ধির তিনটি ক্রম দেখান হইয়াছে এবং সেই অনুসারে বর্ত্তমান সূক্তকে তিনটি তিনটি ঋক্ করিয়া তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম তিনটি ঋকে প্রাণশক্তির শুদ্ধি ও সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। বায়ুই প্রাণশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিতেছে "বায়ুঃ প্রাণঃ", ঋগ্বেদও অন্যত্র স্পষ্ট বলিয়াছে "প্রাণাৎ বায়ুরজায়ত"। এই বায়ু বা প্রাণশক্তিই হইতেছে সাধারণ জীবন-ধর্ম্মের কেন্দ্র। কারণ প্রাণই হইতেছে কামনার, ভোগের, বিষয়ানন্দের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু প্রাকৃত প্রাণ হইতেছে অন্ধ অজ্ঞান, ইহা চায় বাসনার তৃপ্তি—ক্ষুদ্রের ক্ষণিকের আনন্দ। তাই সাধক বলিতেছে বায়ুকে হইতে হইবে "দর্শত" অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিযুক্ত, তাহাকে আস্বাদন করিতে হইবে বিশুদ্ধ সোমধারা অর্থাৎ বস্তুর অন্তর্নিহিত দিব্য আনন্দ। সোমরস হইতেছে তুরীয়ানন্দ, অমৃতত্ব—আনন্দং অমৃতং—দেবতার দিব্যসত্তার চিদ্‌ঘন জ্যোতির্ম্ময় রসায়ন। প্রাণের মধ্যে ধরিতে হইবে এই তুরীয়ের দিব্য আনন্দের অমৃতধারা। সত্যকে সাক্ষাৎ জ্ঞানের ছন্দে ও কথায় (উক্‌থ) প্রকটিত করিতে হইবে, এই উপলব্ধ সত্যের আনন্দ প্রাণে মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে হইবে—যাহারা তাহা পারিয়াছে তাহারাই

"অহর্বিদঃ" অর্থাৎ দিনের আলোক পাইয়াছে, তাহারা আর ক্ষুদ্র ভোগের ভিখারী নয়, তাহাদের অমৃতময় আনন্দ আধারের প্রতি অঙ্গ ভরিয়া দিয়া, সজীব করিয়া দিয়া চলিয়াছে (উরুচী সোমপীতয়ে)।

প্রাণের মধ্যে চাই জ্যোতির্ম্ময় বৃহৎ আনন্দ। সেই জন্যই প্রয়োজন প্রাণকে ছাড়িয়া মনকে শুদ্ধ ও সিদ্ধ করিয়া তোলা। শুদ্ধ ও সিদ্ধ মনের দেবতা হইতেছে ইন্দ্র, যিনি ইন্দ্রিয়রাজীর দিব্যাধিপতি। ইন্দ্র দিতেছেন শুদ্ধ বুদ্ধি, এই শুদ্ধবুদ্ধির সহায়ে সাধক প্রাণে প্রতিষ্ঠা করিতেছে শুদ্ধ ভোগ,—সত্যের সারসত্তার পরিপূর্ণতার সমৃদ্ধ আনন্দ (বাজিনীবসূ)। দ্বিতীয় ত্রয়ীতে তাই ইন্দ্র ও বায়ুর যুগপৎ উদ্বোধন করা হইয়াছে।

শেষ ত্রয়ীতে পূর্ণ সিদ্ধির, সাধকের গন্তব্যের কথা বলা হইতেছে। প্রাণ শুদ্ধ হইলে, মন শুদ্ধ হইলেই সাধক প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই বৃহতের জগতে স্বর্লোকে। বৃহতের দেবতা হইতেছে বরুণ। বরুণের অসীম প্রসারে যে ছন্দ, যে সামঞ্জস্যের সম্মিলনের ধর্ম্ম তাহারই নাম মিত্র। বরুণদেব আমাদের সাধারণ জ্ঞানের খণ্ডতা ভিন্নতা বিদূরিত করিতেছেন, যে মানবীশক্তি আমাদিগকে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিতেছে তাহাকে দীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, তাই তিনি 'রিশাদসং'। আর মিত্রের হইতেছে দিব্য সত্য নির্দ্দেশ (পূত দক্ষং), তাঁহার বিশুদ্ধ নিরিখ দিয়া তিনি প্রত্যেক জিনিষকে প্রত্যেক জিনিষের সহিত সত্য সম্বন্ধে মিলাইয়া ধরিতেছেন। অনন্তের বৃহতের অখণ্ড সামঞ্জস্যে যখন সাধক উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন তখনই তিনি পাইয়াছেন মূল সত্য ও তাঁহার কর্ম্ম তখন সেই সত্যের অব্যর্থ অটুট প্রকাশ। ইন্দ্রের শুদ্ধ বুদ্ধি, কারণ ইন্দ্রের পিছনেই আছে ভূমার শক্তিদ্বয়—বরুণ ও মিত্র। ইঁহারাই বুদ্ধিকে জ্ঞানঘন তেজোঘন করিয়া তুলিয়াছে (ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা), ইঁহারাই

কবি অর্থাৎ সত্যের দ্রষ্টা। ইহাদেরই অনন্ত বিস্তারে, শাশ্বত ছন্দে, ইহাদেরই অন্তর্নিহিত সত্যের অব্যর্থ ধর্ম্মে (ঋতং) সাধক লাভ করিতেছে তপঃশক্তির বিপুল প্রেরণা (বৃহৎ ক্রতুং), জীবনের কর্ম্মে অব্যাহত অব্যাভিচারী কৌশল (দক্ষং দধাতে অপসং)।

তৃতীয়ং সূক্তং

অশ্বিনা যজ্বরীরিষো দ্রবৎপাণী শুভস্পতী।
পুরুভুজা চনস্যতং ॥ ১ ॥

অশ্বিনা (হে অশ্ববন্ত অর্থাৎ অশ্বারোহী যুগল!) দ্রবৎপাণী ('দ্রবৎ', ছুটিয়া চলিয়াছে যাহাদের 'পাণি', পদ। 'পাণি'=সাধারণভাবে যে-কোন কর্ম্মেন্দ্রিয়। শুভস্পতী (যাহারা 'শুভ' আনন্দময় কল্যাণের অধিপতি) পুরুভুজা ('পুরু' বহুল যাহাদের ভোগ) [তোমরা] যজ্বরীঃ (যজ্ঞীয় সাধনযজ্ঞ নিষ্পাদক) ইষঃ (প্রেরণা সকল) চনস্যতম্ (উপভোগ, আস্বাদন কর)।

অশ্বিনা পুরুদংসসা নরা শবীরয়া ধিয়া।
ধিষ্ণ্যা বনতং গিরঃ ॥ ২ ॥

অশ্বিনা, পুরুদংসসা (হে বহুকর্ম্মা! দংস=কর্ম্ম) নরা (হে বীর!) শবীরয়া (তেজোময়, জ্বলন্তশক্তি যাহাতে সেই) ধিয়া (ধী, বুদ্ধির সহায়ে), ধিষ্ণ্যা (হে ধীমান, ধীষণাযুক্ত) [দুজনা তোমরা] গিরঃ (সত্যের বাক্, প্রকাশাত্মক মন্ত্রসকল) বনতং (সম্ভোগ কর, উহাদের আনন্দ গ্রহণ কর)।

দস্রা যুবাকবঃ সুতা নাসত্যা বৃক্তবর্হিষঃ।
আয়াতং রুদ্রবর্ত্তনী ॥ ৩ ॥

দস্রা (হে আশুকর্ম্মা, সিদ্ধ কর্ম্মা), নাসত্যা (হে পথ পরিচালক, দিশারী—নস্=পথ চলা বা দেখান), রুদ্রবর্ত্তনী (হে উগ্রগতিশালী) [তোমরা দুইজনে] বৃক্তবর্হিষঃ ('বৃক্ত' পরিষ্কৃত আস্তৃত করিয়াছে বর্হি আসন যে সেই যাজ্ঞিক সাধকের) যুবাকবঃ ('যুবাকু', যৌবনশালী, চিরতরুণ), সুতাঃ (নিঙড়ান বা প্রস্তুত সোমরস সকলের, শুদ্ধ আনন্দরাজীর নিকটে ; আয়াতং (এস)।

তৃতীয় সূক্ত

হে অশ্বারোহী যুগল ! শ্রেয়ের অধিপতি তোমরা, বহুল তোমাদের ভোগসামর্থ্য। দ্রুতবেগে ছুটিয়া এস, যজ্ঞমুখী যত প্রেরণা তাহার আনন্দ আস্বাদন কর ॥ ১ ॥

হে অশ্বিদ্বয় ! বহুল তোমাদের কর্ম্মশক্তি, বীর দেবতা তোমরা। তেজোময় বুদ্ধির সহায়ে, হে স্থিরবুদ্ধিশালী ! উপভোগ কর তোমরা সত্যের যত বাণী ॥ ২ ॥

হে সিদ্ধকর্ম্মী ! হে দিশারী নেতা ! আসন যে সাজাইয়া রাখিয়াছে তাহার প্রস্তুত তরুণ সোমরসে এস তোমরা উগ্রগতি ভরে ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ
অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র), চিত্রভানো (হে বিচিত্র জ্যোতিসম্পন্ন) আয়াহি (এস)। ইমে (এই সকল) সুতাঃ ত্বায়বঃ (তোমার অভিলাষী—'ত্বায়ুঃ'—যেমন, 'দেবয়ু' 'ধিয়ায়ুঃ'—য়ু=চাওয়া)। [ইহারা] তনা (শারীর প্রতিষ্ঠানে রূপায়নে) অণ্বীভিঃ (সূক্ষ্মশক্তি-সত্ত্বের দ্বারা) পূতাসঃ (বিশুদ্ধ হইয়াছে)।

ইন্দ্রায়াহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ।
উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥ ৫ ॥

ইন্দ্র, ধিয়া (বুদ্ধির দ্বারা) ইষিতঃ (প্রণোদিত হইয়া), বিপ্রজূতঃ (জ্ঞানীর দ্বারা প্রচালিত হইয়া) [তুমি] সুতাবতঃ (সোমবান্ যে) বাঘতঃ (বাক্‌কর্ম্মা, সত্য-উচ্চারণকারী যাজ্ঞিক তাহার) উপ ব্রহ্মাণি (অন্তরাত্মার সত্যমন্ত্রের সমীপে) আয়াহি।

ইন্দ্রায়াহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ।
সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ॥ ৬ ॥

ইন্দ্র, হরিবঃ (জ্যোতির্ম্ময় অশ্ববন্ত, দীপ্তিশালী) [তুমি] তূতুজানঃ (ত্বরা করিয়া, সবেগে) উপব্রহ্মাণি আয়াহি। নঃ (আমাদের) সুতে (সোমরসে) চনঃ (আনন্দ, তৃপ্তি) দধিষ্ব (স্থাপন কর, ধরিয়া রাখ)।

এস, ইন্দ্র! বহুধা জ্যোতি লইয়া। এইসব রসের ধারা তোমাকেই চাহিয়া চলিয়াছে। সূক্ষ্ম শক্তিরাজি ইহাদিগকে বিশুদ্ধ করিয়াছে, নূতন রূপের মধ্যে ধরিয়া দিয়াছে ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! বুদ্ধি তোমাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে, দ্রষ্টার দীপ্তজ্ঞান তোমাকে ছুটাইয়া লইয়াছে। রসপ্রতিষ্ঠ যে যাজ্ঞিক সত্যকে উচ্চারিত করিতেছে, এস তুমি তাহার অন্তরাত্মার বাণীর মধ্যে ॥ ৫ ॥

এস ইন্দ্র! অন্তরাত্মার বাণীর মধ্যে তোমার ভাস্বর অশ্বে সবেগে ছুটিয়া। আনন্দকে প্রতিষ্ঠিত কর আমাদের রসায়নে ॥ ৬ ॥

ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বেদেবাস আগত।
দাশ্বাংসো দাশুষঃ সুতং ॥ ৭ ॥

বিশ্বে দেবাসঃ (হে সকল দেবতা) [তোমরা] ওমাসঃ (পরিপোষক, ভর্ত্তা) চর্ষণী ধৃতঃ (কর্ম্মী বা কর্ম্মচক্রের ধারয়িতা), দাশ্বাংসঃ (যথাভাগ-প্রদাতা, বণ্টনকারী, পরিবেষণ-কারী—আধারের যে অংশে যে স্তরে যে সিদ্ধি প্রয়োজন তাহা যথাযোগ্যভাবে দিতেছে যাহারা), দাশুষঃ (প্রদাতার, উৎসর্গকারীর) সুতং (সোমরসের নিকটে, মধ্যে) আয়াত (এস)।

বিশ্বেদেবাসো অপ্‌তুরঃ সুতমাগন্ত তূর্ণয়ঃ।
উস্রা ইব স্বসরাণি ॥ ৮ ॥

বিশ্বে দেবাসঃ, অপ্‌-তুরঃ (জলধারা উত্তীর্ণ হইয়া চলে যাহারা) তূর্ণয়ঃ (ত্বরিতগতি-শালী অথবা উত্তীর্ণ করাইয়া দেয় যাহারা), [তাহারা] উস্রাঃইব (গোযূথ, আলোকরাজী যেমন) [আসে] স্বসরাণি (নিজ ভবনে) [তেমনি] সুতং আগন্ত (আসুক)।

সত্তার যে নানা ধারা তাহাকেই জলধারার সহিত তুলিত করা হয়। সত্য সত্তার যে গতি তাহাই স্রোতস্বিনী। স্থূল শরীরে জলের স্থান ও কার্য্য স্মরণীয়।

বিশ্বে দেবাসো অস্রিধ এহিমায়াসো অদ্রুহঃ।
মেধং জুষন্ত বহ্নয়ঃ ॥ ৯ ॥

বিশ্বে দেবাসঃ, অস্রিধঃ (স্খলন নাই যাহাদের, অটল), এহি মায়াসঃ ('মায়া', জ্ঞানের রূপ গড়িতেছে যাহারা। এহি—ঈহ্‌=চেষ্টা), অদ্রুহঃ (আঘাত রহিত) বহ্নয়ঃ (বাহক) [তাহারা] মেধং (যজ্ঞকে) জুষন্ত (সম্ভোগ করুক, যজ্ঞের সহিত সংযুক্ত হইয়া রহুক)।

ভর্ত্তা তোমরা, কর্ম্মীসঙ্ঘকে তোমরাই ধারণ করিয়া আছ, হে সকল-দেবতা ! সাধকের সোম পরিবেষণে, হে পরিবেষক-বৃন্দ ! এস তোমরা ॥ ৭ ॥

হে সকল-দেবতা ! জলরাশী তোমরা পার হইয়া চল, ভীমবেগে এস তবে, এস আলোকযূথের মত তোমাদের নিজশালা এই রসধারার অভিমুখে । ৮ ॥

অটল এই সকল-দেবতা, অক্ষত তাহারা, জ্ঞানের রূপ গড়িয়া তুলিতে যত্নবান । অগ্নিময় বাহক তাহারা, যজ্ঞকে যেন দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥ ১০ ॥

নঃ (আমাদের) পাবকা (শুদ্ধিকারিণী), বাজেভিঃ (সকল ঋদ্ধিতে, পূর্ণসম্পদে) বাজিনীবতী (ঋদ্ধিময়), ধিয়াবসুঃ (বুদ্ধি যাঁহার 'বসু' বা সত্তার সম্পদ সেই) সরস্বতী (সত্যপ্রেরণার বাঙ্ময়ী শক্তি, দিব্যশ্রবণের অধিষ্ঠাত্রীদেবী, শ্রুতি) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) বষ্টু (আকাঙ্খা করুন)।

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥ ১১ ॥

সূনৃতানাং (কল্যাণময় সত্যবাক্ সকলের) চোদয়িত্রী (চালয়িত্রী), সুমতীনাং (সত্য-চিন্তা, সত্য-মননের) চেতন্তী (উদ্বোধয়িত্রী, জাগরণকারিণী) সরস্বতী (জ্ঞানের যে বাঙ্ময় প্রেরণা তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী) যজ্ঞং দধে (ধারণ করিয়া আছেন)।

মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।
ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি ॥ ১২ ॥

সরস্বতী (দিব্যবাক্) কেতুনা (সত্যবোধের, জ্ঞানের দ্বারা) মহঃ (মহান্, বৃহতের) অর্ণঃ (সাগরকে) প্রচেতয়তি (জাগাইয়া তুলিতেছেন,—আত্মবুদ্ধ, জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ করিতেছেন), বিশ্বা (সকল) ধিয়ঃ বিরাজতি (বিকশিত করিতেছেন)।

আমাদিগকে শুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন সকল ঋদ্ধিতে সমৃদ্ধা সত্য-শ্রবণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। তিনি আমাদের যজ্ঞ কামনা করুন, শুদ্ধা বুদ্ধি তাঁহারই সত্তার সম্পদ ॥ ১০ ॥

সত্য বাক্যকে অনুপ্রাণিত করিয়া, সত্য চিন্তাকে সচেতন করিয়া, দেবী সরস্বতী যজ্ঞকে ধারণ করিয়া আছেন ॥ ১১ ॥

বৃহতের মহাসাগর আপন জ্ঞানের দ্বারা সজ্ঞান করিয়া তুলিয়াছেন সরস্বতী, যাবতীয় সত্যবুদ্ধি তিনি চারিদিকে প্রকাশিত করিয়া ধরিয়াছেন ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য

প্রাণে চাই শুদ্ধ শান্ত সমর্থ আনন্দ। আনন্দের ভিতর দিয়াই জ্ঞানের কর্ম্মের—সত্যের প্রকাশ। জীবনীশক্তির প্রেরণা যতই অমৃতময়, ভাগবতরসে ভরপুর হইয়া উঠে, সাধক ততই শুদ্ধবুদ্ধির মধ্যে, দিব্যশক্তির পূর্ণতার মধ্যে যাইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় ও পরিশেষে মন বুদ্ধির উপরে বৃহতের—সাক্ষাৎ দৃষ্টির, সাক্ষাৎ সৃষ্টির সকল ধারা জাগ্রতে প্রকাশ করিয়া ধরে।

বর্ত্তমান সূক্তের তিন তিনটি শ্লোকে এক একটি থাক বাঁধা হইয়াছে এবং সাধনার ক্রম অনুসারে এই রকমে চারিটি থাক দেখান হইয়াছে।

প্রথম থাক (১-৩)। গোড়ায় আহ্বান করা হইতেছে অশ্বিযুগলকে। এই অশ্বারোহী কাহারা? অশ্বিনীকুমার সাধারণতঃ পরিচিত—পৌরাণিক ব্যাখ্যা অনুসারে—দেব-বৈদ্যরূপে। অর্থাৎ তাঁহারা আধার হইতে রোগ জরা অক্ষমতা দূর করিয়া দেন, জীবনীশক্তিকে শুদ্ধ সুস্থ সবল করিয়া তোলেন। অন্য কথায় তাঁহারা হইতেছেন অমৃতত্বের দেবতা, তাঁহাদের কাজ প্রাণে অমৃতত্ব—দেবত্বের চিরযৌবন (যুবাকবঃ) প্রতিষ্ঠা করা। প্রাণবায়ুই অশ্বরূপে পরিকল্পিত এবং এই প্রাণবায়ু যে দেবশক্তির বাহন, তাঁহারাই দিব্য অশ্বী। তাঁহাদের যুগলরূপ কেন? বোধহয় একজন দিতেছেন জ্ঞান আর একজন দিতেছেন কর্ম্মশক্তি, এইজন্য। উভয়েই অমৃতত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, উভয়েই হইতেছে মূর্ত্ত কল্যাণতম আনন্দ (শুভস্পতী), প্রাণে বহুল দিব্য ভোগ তাঁহারা আনিয়া দেন (পুরুভুজা)—তবে একজন চলেন কর্ম্মশক্তির দিক দিয়া (দংস), আর একজন জোর দেন সমর্থ বিশুদ্ধবুদ্ধির উপর (ধিয়া)। যাহা হউক, পার্থক্য যাহাই হউক, উভয়ে একই দেবতার দুই মুখ। অশ্বিদ্বয় প্রাণের মধ্যে সেই দিব্যরসায়নের উৎস খুলিয়া দিতেছেন, যাহার জোরে সাধকের আধারে জাগিয়াছে, উঠিয়া চলিয়াছে সাধনার ঊর্দ্ধমুখী প্রেরণা (যজ্বরীঃ ইষঃ)—একটা নিবিড় বহুমুখী আনন্দের অধিকারী হইয়াছে বলিয়াই সাধক আপনাকে ক্রমে আহুতি দিয়া, নীচের প্রেরণাকে উপরের প্রেরণার কাছে উৎসর্গ করিয়া অগ্রসর হইতেছে। অমৃতায়িত প্রাণশক্তিই সকল সিদ্ধিকে বাস্তবে রূপবান করিয়া ধরিতেছে, (দস্রা, পুরুদংসসা) বুদ্ধির মধ্যে তেজ ও সামর্থ্য স্থাপন করিতেছে (শবীরয়া ধিয়া), এবং সাধকের খুলিয়া দিতেছে সেই দিব্য শ্রবণ,

সেই মন্ত্রশক্তি যাহা সত্যকে ফুটাইয়া প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে (গিরাঃ)। এইজন্যই এই দেবতাযুগল হইতেছে 'নাসত্য', পথের দিশারী, সাধন-যাত্রায় তাঁহারাই আমাদের নেতা, স্তরের পর স্তর পার করাইয়া তাঁহারা সবেগে আমাদিগকে চালাইয়া লইয়াছেন (রুদ্রবর্ত্তিনী) সমুচ্চের সত্যের বৃহৎ সাগরের পারে।

দ্বিতীয় থাক (৪-৬)। প্রাণের এই দিব্য আনন্দ, এই অমৃতময় শক্তি দাঁড়াইবে সমগ্র আধারের একটা শান্ত নির্ম্মল স্থির প্রতিষ্ঠায় (বৃক্তবর্হিষঃ)। এই অমৃতানন্দই সাধককে লইয়া চলিবে দিব্যমানসে, বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে, ইন্দ্রের লোকে। মানুষের উপরকার মন, শুদ্ধবুদ্ধি যে খোলে না, সে যে নীচের ক্ষুদ্র জড়বুদ্ধির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তাহার কারণ, প্রাণের অশুদ্ধ চঞ্চল ব্যাধিগ্রস্ত বাসনাময় প্রকৃতি, বাহিরের দিকে পৃথিবীর দিকে টান। স্থূল জড় প্রেরণা নয়, কিন্তু অন্তর্মুখী সূক্ষ্মশক্তির সহায়ে (অণ্বীভিঃ), প্রাণের আনন্দ স্বচ্ছ শুদ্ধসত্ত্ব করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই মনের জড়তা ঘুচিয়া সেখানে দেখা দিবে দিব্যবুদ্ধি (ত্বায়বঃ)। ইন্দ্রের দিব্যবুদ্ধির সহায়েই সাধক প্রাণে শুদ্ধানন্দ উপভোগ করে, ইন্দ্রই ফুটাইয়া ধরে বস্তুতে বস্তুতে জ্যোতির্ম্ময় সত্যের বিচিত্ররূপ (চিত্রভানো)। ইন্দ্রের ভাস্বর জ্ঞানবিগ্রহ প্রেরণারাজী (হরিবঃ) তখন বহিয়া আনে, প্রকাশ করে—জড়বুদ্ধির বাসনা নিয়ন্ত্রিত অসত্য সত্য নয়, কিন্তু অন্তরাত্মার আনন্দের সত্য, সাধকের আপনার ভাগবত পুরুষ চায় যে মর্ম্মবাণী, মন্ত্র (ব্রহ্মাণি)।

তৃতীয় থাক (৭-৯)। তারপরেই সাধক উঠিয়া যায় দেবলোকে, শুদ্ধ মনের অর্থাৎ দ্যৌ'র উপরে স্বর্লোকে - সত্যং ঋতং বৃহতের প্রতিষ্ঠানে, যেখানে সকল দেবতাই তাহার সত্তার ও শক্তির মধ্যে

বিগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। বিশ্বদেবতা হইতেছে সকল দেবতার সমবেত শক্তি—প্রত্যেক দেবতা এক একটা বিশেষ সত্যকে ও ধর্ম্মকে ফুটাইয়া ধরিতেছেন, নিজের নিজের ব্রত উদ্যাপন করিয়া প্রত্যেকে আবার প্রত্যেকেরই ব্রত উদ্যাপনের সহায় হইতেছেন এবং এই রকম সকলে মিলিয়া একই মহান বৃহৎ সত্যের ও ধর্ম্মের বহু বিচিত্র মূর্ত্তি গড়িয়া ধরিতেছেন (এহিমায়াসঃ)। এই সকল দেবতার শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেই সাধকের সাধনযজ্ঞ অটুট অব্যর্থভাবে উর্দ্ধে উঠিয়া স্তরের পর স্তর পার হইয়া চলে। আধারের মধ্যে যে নানা স্তর—দেহ প্রাণ মন প্রভৃতি—তাহারা এক একটা সত্যের ধারা এবং ইহারাই সিন্ধু বা জলরূপে পরিকল্পিত। সত্তার রসায়িত স্বরূপই হইতেছে 'অপ্'। এবং বিশ্বদেবতাবৃন্দ সাধককে নীচের দিক হইতে এক একটা সিন্ধু ধারা পার করাইয়া (অপ্তুরঃ) ক্রমে উপরের তুরীয়ের মহাসাগরে লইয়া চলেন, যাহা হইতেছে দেবতাদের এবং সাধকেরও নিজের আসল গৃহ, পূর্ণস্বরূপের জ্যোতির্ম্ময় প্রতিষ্ঠান (স্বসরাণি)। 'উস্রা' অর্থ গো বা জ্যোতিরাজী—বেদে গো এবং আলোক একই পর্য্যায়ভুক্ত।

চতুর্থ থাক (১০-১২)। ফল, পূর্ণ সত্যের পূর্ণ প্রেরণাসম্পদ (বাজেভিঃ বাজিনীবতী)। সরস্বতী অর্থ গতিশালিনী—ছন্দায়িত সত্য। সরস্বতী হইতেছেন দিব্যশ্রুতি। দিব্যদৃষ্টির সহায়ে আমরা সত্যকে দেখি, সাক্ষাৎ করি, কিন্তু দিব্যশ্রুতির সহায়ে সত্যকে আমরা সচল, স্পষ্টিপর করিয়া তুলি, স্রোতধারার মত সত্যের শক্তিকে স্তরে স্তরে বহাইয়া দেই। সত্যের রূপ যেমন আছে, তেমনি তাহার আছে নাম। রূপের ও নামের সহায়েই সত্য বাস্তব হইয়া উঠিতেছে। দিব্য দৃষ্টিতে পাই সত্যের রূপ আর দিব্য শ্রুতিতে পাই সত্যের নাম। সরস্বতী

দিতেছেন সত্যের দিব্য নাম (দিব্য রূপ দিতেছেন 'ইলা')। সত্যেরই অনুপ্রেরণায় অসত্য সব দূর হইয়া যাইতেছে তাই সরস্বতী আমাদের শুদ্ধিদাত্রী (পাবকা)। সতের বৃহৎ সাগর (মহো অর্ণঃ) রহিয়াছে মনের উপরে, কিন্তু তাহার জ্ঞান অনুভূতি আমাদের নাই, সে সম্বন্ধে আমরা অচেতন। সরস্বতী বুদ্ধিকে উহার মধ্যে তুলিয়া ধরিতেছেন, শুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যে উহার নামটি ধরিয়া দিয়া উহাকে আমাদের জ্ঞানগোচর করিয়া ধরিতেছেন, সত্যের ধর্ম্মে সত্যের আলোকে ক্রমে চালাইয়া লইয়া আমাদের সাধনযজ্ঞকে সার্থক করিতেছেন—পরিপূর্ণ জ্ঞান, জ্ঞানের যে বহুল রূপায়ন তাহাকে জাগ্রত্তে প্রকট করিতেছেন।

বৈদিক সাহিত্যে বাক্, নাম বা মন্ত্রের উল্লেখ আমরা পদে পদে পাই। ফলতঃ সত্যের যে বাঙ্ময় রূপ তাহাকে ধরাই সমস্ত বৈদিক সাধনার লক্ষ্য, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সত্যদ্রষ্টা বৈদিক ঋষি-দিগকে তাই বলা হয় মন্ত্রদ্রষ্টা বা মন্ত্রকর্ত্তা। বাক্ হইতেছে সত্যের সচল বিগ্রহ। সত্যের যে সত্তা তাহাতে আছে একটা ছন্দ এবং এই ছন্দের গতি প্রতিরণিত করিয়া তুলিয়াছে একটা সুর, ইহাকেই পরবর্ত্তীকালে বলা হইয়াছে 'নাদ' বা 'শব্দব্রহ্ম'। এই ছন্দ, এই সুর যখন আমাদের মনের মধ্যে, বুদ্ধিতে ফুটিয়া উঠে, তখনই তাহা আকার গ্রহণ করে বাক্যের কথার মধ্যে, তাহাই সত্যমন্ত্র। যে ভাষা যত নিবিড়ভাবে সাক্ষাৎভাবে সত্যের আদি ছন্দ ও রূপ মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে পারে তাহাই তত জাগ্রত মন্ত্র। তাই মন্ত্রকে যে সাধক অধিকার করিতে পারিয়াছে, তিনি সত্যকে, সত্যের শক্তিকেই অধিকার করিয়াছেন। সত্যের যে নাম তাহার বহু প্রকারভেদ বৈদিক ঋষিগণ দিয়াছেন, যেমন—ঋক, স্তোম, উক্থ, ব্রহ্ম ইত্যাদি। বর্ত্তমান সূক্তেও সত্যের সাধনায় প্রথমে

অশ্বিদের সহায়ে চাওয়া হইতেছে 'গিঃ' অর্থাৎ যে বাক্, যে নাম সত্যকে প্রকাশ করে, সাধকের চেতনায় স্পষ্ট করিয়া স্ফুট করিয়া একটা রূপ দিয়া ধরাইয়া দেয়। তারপর ইন্দ্রের সহায়ে চাওয়া হইতেছে ব্রহ্ম অর্থাৎ অন্তরাত্মার সত্যবাণী। মানুষের যখন হয় শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি, তখনই সে খোঁজ পায় আপনার ভিতরকার আসল জীবরূপ শিব এবং এই সত্য পুরুষের অন্যনাম ব্রহ্মণস্পতি অর্থাৎ যিনি অন্তরাত্মার, অন্তরাত্মার সত্যবাক্'এর অধিপতি। আর সর্ব্বশেষে হইতেছেন সরস্বতী, যিনি বৃহৎ সত্যের—বিশ্বদেবতার বহুল বিপুল সত্য যাহার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়াছে, সেই সত্যের শক্তি।

চতুর্থং সূক্তং

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে।
জুহূমসি দ্যবি দ্যবি ॥ ১ ॥

সুরূপ-কৃত্নুং ('সু' সুন্দর নির্দ্দোষ 'রূপ' আকার অবয়ব আয়তন 'কৃত্নুং' গড়িয়া দিতেছেন যিনি), গোদুহে (গোদোহকের কাছে, জ্যোতি হইতে অমৃতধারা দোহন করে যে সাধক তাহার কাছে) সুদুঘাং ইব (সুখে, সুন্দর বা পূর্ণভাবে দোহন করিতে দেয় যে পয়স্বিনী তাহার মত যিনি) [তাঁহাকে] উতয়ে (কল্যাণের, কুশলের, স্বস্তির জন্য) দ্যবি দ্যবি (দিনে দিনে) জুহূমসি (আমরা আহ্বান করিতেছি)।

উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব।
গোদা ইদ্রেবতো মদঃ ॥ ২ ॥

নঃ (আমাদের) সবনা উপ (ভিয়ানের, সোম নিষ্পেষণের, অভিসবনের নিকট) আগহি (এস)। সোমপাঃ (হে সোমপায়ী) সোমস্য (সোম) পিব (পান কর)। ইৎ (সত্যই) রেবতঃ (পূর্ণানন্দময়ের অর্থাৎ ইন্দ্রের) মদঃ (তীব্রানন্দ) গোদাঃ (আলোকদাতা)।

অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাং।
মা নো অতিখ্য আগহি ॥ ৩ ॥

অথা (তবে, তাহা হইলে) তে (তোমার) অন্তমানাং (অন্তরতম) সুমতীনাং (নির্দ্দোষ মনোভাব সকলের) বিদ্যাম (জ্ঞান পাইব)। নঃ (আমাদের কাছে) মা অতিখ্যঃ (অতিরিক্ত প্রকাশ করিও না), আগহি (এস)।

চতুর্থ সূক্ত

সিদ্ধরূপ যিনি গড়িয়া তুলিতেছেন, যিনি দোহকের কাছে যেন সুখদোহনীয় পয়স্বিনী, স্বস্তির জন্য তাঁহাকে আমরা দিনের পর দিন আহ্বান করিতেছি ॥ ১ ॥

এস আমাদের সকল অভিসবনের নিকটে। হে রসপায়ী! পান কর রস। পূর্ণসার্থকতা যাঁহাতে তাঁহার আনন্দের উল্লাস আলোকই দান করিতেছে ॥ ২ ॥

তবেই তোমার অন্তরতম যত সিদ্ধ মনোভাব, পাইব তাহাদের জ্ঞান। তোমার প্রকাশ যেন আমাদের ধারণাতীত না হয়, এস সেই ভাবে ॥ ৩ ॥

পরেহি বিগ্রমস্তৃতমিন্দ্রং পৃচ্ছা বিপশ্চিতং।
যস্তে সখিভ্য আবরং ॥ ৪ ॥

পরা ইহি (এপারে, পার হইয়া, উঠিয়া এস)। ইন্দ্রং (ইন্দ্রকে) পৃচ্ছা (জিজ্ঞাসা কর), [যিনি] বিগ্রং (বিক্রমী—লাতিন Vigor), অস্তৃতং (অচ্যুত, অপরাজিত) বিপশ্চিতং (জ্যোতির্ম্ময় চেতনা যাহার, জ্ঞানী), যঃ (যিনি) তে (তোমার) সখিভ্যঃ (সখাবৃন্দের জন্য) বরং (বরণীয় বস্তু, আকাঙ্ক্ষিত ধন) আ (আনিয়া দিয়াছেন,—ক্রিয়া পদ উহ্য)।

সাধক তাহার সতীর্থকে অথবা নিজেকেই এই কথাগুলি বলিতেছে।

উত ব্রুবন্তু নো নিদো নিরন্যতশ্চিদারত।
দধানা ইন্দ্র ইদ্দুবঃ ॥ ৫ ॥

নঃ (আমাদের) নিদঃ (যাহারা বাঁধিয়া বা আটকাইয়া রাখে, যাহারা তিরস্কার করে, দোষ দেয়) উত [তাহারাও] ব্রুবন্তু (বলিয়া উঠুক), ইন্দ্রে ইৎ (ইন্দ্রের উপরেই) দুবঃ (কর্ম্মকে, সাধনা প্রচেষ্টাকে) দধানা (স্থাপিত করিয়া) [তোমরা] অন্যতঃ চিৎ (অন্যত্র পর্যান্ত, অন্যান্য ক্ষেত্র অবধি) নির্ + আরত (উঠিয়া যাইয়া যুদ্ধ কর, কর্ম্মপর হও।

উত নঃ সুভগাঁ অরির্বোচেয়ুর্দস্ম কৃষ্টয়ঃ।
স্যামেদিন্দ্রস্য শর্ম্মণি ॥ ৬ ॥

দস্ম (হে সিদ্ধকর্ম্মী, কৃতকর্ম্মী), উত (আর) অরিঃ (যোদ্ধারা, আর্য্যেরা) কৃষ্টয়ঃ (কর্ম্মীরা) নঃ (আমাদিগকে) সুভগান্ (পরম আনন্দের ভোক্তা, পূর্ণ কল্যাণভাগী বলিয়াই) বোচেয়ুঃ (যেন ঘোষণা করে) ইন্দ্রস্য (ইন্দ্রের) শর্ম্মণি (শান্তির মধ্যে) স্যাম (আমরা যেন থাকি)।

চল পার হইয়া। জিজ্ঞাসু হইয়া যাও বিক্রমী অজেয় জ্ঞানদীপ্ত ইন্দ্রের কাছে। তিনিই তোমার সাথী-সকলকে তাহাদের আকাঙ্ক্ষার ধন আনিয়া দিয়াছেন ॥ ৪ ॥

আর, যে সব শক্তি আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহে, তাহারাও বলিয়া উঠুক—"অগ্রসর হও, অন্যত্রও গিয়া সাধনশীল হও, ইন্দ্রের মধ্যে তোমার কর্ম্মচেষ্টাকে সর্ব্বদা ধরিয়া রাখ" ॥ ৫ ॥

আর্য্যযোদ্ধা যাহারা, কর্ম্মের সাধক যাহারা, হে সিদ্ধকর্ম্মী! তাহারাও যেন ঘোষণা করে যে আমরা পূর্ণানন্দই ভোগ করিতেছি। ইন্দ্রেরই শান্তির মধ্যে আমরা যেন প্রতিষ্ঠিত হই ॥ ৬ ॥

এমাশুমাশবে ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনং।
পতয়ন্ মন্দয়ৎসখং ॥ ৭ ॥

ঈং (এই) আশুং (তীব্রকে—লাতিন acus, ইংরাজি acute—অর্থাৎ সোমরসকে) আশবে (তীব্রের জন্য, তীব্রগুণী ইন্দ্রের জন্য) আভর (লইয়া চল, বহিয়া লও), [যাহা] যজ্ঞশ্রিয়ং (যজ্ঞের শ্রী), নৃমাদনং (দেবশক্তির আনন্দদায়ক—নৃ=শক্তিমান দেবতা অথবা দেবতার মানুষীরূপ), পতয়ৎ (ছুটাইয়া চালাইতে চালাইতে) মন্দয়ৎসখং (তাঁহাকে যিনি আপন সখাবৃন্দকে আনন্দ দিতেছেন)। এম্=আ+ঈং।

অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ।
প্রাবো বাজেষু বাজিনং ॥ ৮ ॥

অস্য (ইহা) পীত্বা (পান করিয়া) শতক্রতো (হে শতকর্ম্মী ! ক্রতু=কর্ম্মশক্তি, ইচ্ছাবল ; শতসংখ্যা পূর্ণতাবাঞ্জক) বৃত্রাণাং (বৃত্রদের, যাহাদের কাজ অজ্ঞান দিয়া আবৃত করা) ঘনঃ (হন্তা, সংহার কর্ত্তা) অভবঃ (হইয়াছিলে), বাজেষু (সকল ঋদ্ধি, পূর্ণসিদ্ধির মধ্যে) বাজিনং (পূর্ণসিদ্ধকে) প্রাবঃ (বাড়াইয়া তুলিয়াছিলে)।

তং ত্বা বাজেষু বাজিনং বাজয়ামঃ শতক্রতো।
ধনানামিন্দ্র সাতয়ে ॥ ৯ ॥

তং (সেই) বাজিনং ত্বা, শতক্রতো ! বাজেষু বাজয়ামঃ (আমরা পূর্ণ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছি), ইন্দ্র (হে ইন্দ্র), ধনানাং (সিদ্ধির সম্পদ রাজী) সাতয়ে (জয় করিবার জন্য)।

এই তীব্রকে তীব্রের কাছে লইয়া ধর—যজ্ঞের তাহা শ্রী, দেবতার উল্লাস। সম্মুখে চালাইয়া লও তাঁহাকে যিনি আপন বন্ধুজনকে উল্লসিত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ৭ ॥

ইহাই পান করিয়া, হে শতকর্ম্মী! তুমি হইয়াছিলে বৃত্রদের হন্তা, সকল ঋদ্ধির মধ্যে উপচিত করিয়া ধরিয়াছিলে ঋদ্ধকে ॥ ৮ ॥

সেই ঋদ্ধ তোমাকে, হে শতকর্ম্মী! সকল ঋদ্ধির মধ্যে আমরা সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছি, যেন, হে ইন্দ্র! অধিকার করিতে পারি আমরা সকল সম্পদ্ ॥ ৯ ॥

যো রায়োঽবনি মহানৎস্বপারঃ সুন্বতঃ সখা।
তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ১০ ॥

যঃ (যিনি) মহান (মহান, বিরাট), রায়ঃ (পূর্ণ সার্থকতার) অবনিঃ (পরিপোষক, পূর্ণাধার, আকর), সুপারঃ (সম্যক পারকর্ত্তা, নির্ব্বিঘ্নে পার করিয়া দেন যিনি) সুন্বতঃ (সোমবানের, আনন্দপূর্ণ সাধকের) সখা, তস্মা (সেই) ইন্দ্রায় (ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে) গায়ত (গাও, মন্ত্রোচারণ কর)।

ভূমা যিনি সার্থকতার পূর্ণাধার, সুখে যিনি তারণ করিয়া দিতেছেন, অমৃতত্বসেবীর যিনি সখা, গাও সেই ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য

শুদ্ধমনের যে আনন্দময় শক্তি তাহারই জোরে চলিয়াছে সাধনার ক্রম প্রগতি; তাহারই জোরে সকল বাধা, অজ্ঞানের নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ—বৃত্রকে—অতিক্রম করিয়া সাধক বৃহতের মধ্যে, পূর্ণতার মধ্যে সুঠাম জ্ঞানময় রূপ সব সৃষ্টি করিতেছে।

প্রথম তিন শ্লোকে চাওয়া হইতেছে ইন্দ্রের মধুস্রাবী আলো, নিবিড় সুমতি। ইন্দ্র হইতেছে পয়স্বিনী-গো অর্থাৎ জ্যোতির্ম্মণ্ডল, যাহা হইতে সাধক অমৃতত্বেরধারা দুহিয়া লইতেছে, দুহিয়া লইতেছে সুমতি অর্থাৎ প্রসন্ন অন্তঃকরণের গভীরতম প্রত্যয় ও অনুভব। কেন? বৃহতের মধ্যে সাধক যাহাতে পায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশ। সাধারণ অবস্থায় আমাদের হইতেছে খণ্ড চেতনা, বিকৃত সঙ্কীর্ণ মন। সুতরাং আমরা যাহা কিছু করি, যাহা কিছু গড়ি তাহা হইয়া পড়ে কাণা খোঁড়া বোঁচা (বৃত্রকে ঋষিরা 'অনাস' অর্থাৎ নাকহীন বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন)। আমাদের সৃষ্টিকে যদি নির্দ্দোষ শোভনাঙ্গ সুস্থ পুষ্ট আনন্দময় করিয়া তুলিতে হয় তবে এ ঐ খণ্ডতা এই ক্ষুদ্রতা এই দীনতার সীমা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বৃহতের স্বস্তি, কুশল-স্থিতির মধ্যে (উতয়ে) উঠিয়া যাইতে হইবে। অল্পের মধ্যে আমরা সন্তুষ্ট থাকি, কারণ আমাদের আনন্দ আমাদের ভোগ জড়-আয়তনের মধ্যে আবদ্ধ। এই যে একান্ত ইন্দ্রিয়গত সুখ (সোমরসের প্রাকৃত রূপ) তাহা হইতে নিঙড়াইয়া বাহির করিতে হইবে আসল খাঁটি সত্য-আনন্দ, অমৃত—

ইহাকেই বলে 'সবন'। আর এ কাজ সম্ভব হয় ইন্দ্রিয়াধিপতি, শুদ্ধবুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃ-পুরুষ ইন্দ্রের উদ্বোধনে। মন শুদ্ধসত্ত হইলে, মনের দিব্য-পুরুষ জাগিয়া উঠিলে, সাধকের আনন্দ আর ক্ষুদ্রের বিকৃতের জড়ের মধ্যে তৃপ্তি পায় না—দিব্য-মনের উল্লাস জ্যোতিতে ভরপুর (গোদা)। আর এই আনন্দ যে অধিকার করিতে পারিয়াছে সেই পাইয়াছে শুদ্ধ-মনের যত নিবিড় সত্যের সহাস সুভঙ্গিম লীলা (সুমতি)। এইখানে সাধকের একটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। মনের মধ্যে উপরের সত্যের ও শক্তির প্রকাশ যদি হঠাৎ অতিরিক্ত জোরে নামে, তবে হয়ত সাধক তাহাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে নতুবা সে প্রকাশ হয় বিকৃতভাবে, তাহার 'স্বরূপ' আর থাকে না। সেই জন্যই সাধককে বলিতে হইতেছে, "যতটুকু ধারণ করিতে পারি, হে ইন্দ্র! ততটুকু তুমি নিজেকে প্রকাশ কর, তার বেশী নয়।" বেশীকে সম্যক ধারণ করিতে হইলে চাই নীচের স্তরগুলিকে ক্রমে সম্যক শুদ্ধ ও সমর্থ করিয়া তোলা। এই কথাই বলা হইতেছে—পরের শ্লোকগুলিতে।

দ্বিতীয় তিন শ্লোকে সাধকের এই ক্রমিক আরোহণের পন্থা নির্দ্দেশ করা হইতেছে। সাধনা হইতেছে যেন উর্দ্ধদিকে একটা দীর্ঘ পথযাত্রা—সাধককে সে পথে যুদ্ধ করিতে করিতে, নিষ্ঠাভরে পরিশ্রম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়। নীচে থাকিয়া উপরের শক্তিকে নামাইবার চেষ্টা করিলে হইবে না, সাধককেই উঠিয়া চলিতে হইবে (পরেহি), জ্ঞানময় ইন্দ্রের, শুদ্ধমনের মধ্যে যে দিব্য পুরুষ রহিয়াছেন তাঁহার দিকে তাকাইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া, তাঁহারই প্রেরণা অনুসারে চলিতে হইবে। সকল সাধন-চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে যখন ইন্দ্রশক্তির মধ্যে

তুলিয়া ধরিতে পারিব, তখনই অজ্ঞানের ক্ষুদ্রতার যত অশুদ্ধ শক্তি তাহারা আমাদিগকে আর নীচে টানিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না, তাহারাই পথ খুলিয়া দিবে, তাহারাও বলিয়া উঠিবে, "আমাদিগকে জয় করিয়াছ, এখন যাও উপরের আর আর ক্ষেত্রে যে সব শক্তি আছে তাহাদিগকেও গিয়া জয় কর।" বাধারও সার্থকতা আছে। বাধায় বাধায় আমরা শক্ত সমর্থ হইয়া উঠি—বাধা না পাইলে ভিত্তি কাঁচা থাকিয়া যায়। এই রকমে ইন্দ্রের প্রশান্ত প্রতিষ্ঠায় যখন আমরা স্থাপিত হইব তখন যে সব শক্তি সাধককে সাহায্য করিতেছে—সাধকের সাধনার ক্ষাত্রবীর্য্য (অরিঃ) ও কর্ম্মশক্তি (কৃষ্টয়ঃ)—তাহারাই শেষে আমাদিগকে পূর্ণ কল্যাণের পূর্ণ আনন্দের অধিকারী করিতে সক্ষম হইবে।

তৃতীয় তিন শ্লোকে যে রকমে পথের বাধা সব দূর হয় সেইকথা বলা হইতেছে। সাধনার বাধারই অন্য নাম বৃত্র। বৃত্র অর্থ আবরণকারী (বৃ ধাতু হইতে), যাহারা অন্ধকার করিয়া থাকে—নীচের সেই সব অন্ধ-শক্তি যাহারা জ্ঞানের জ্যোতি সাধকের মধ্যে খুলিতে দেয় না। ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া বৃত্রকে হনন করেন। অর্থাৎ বিশুদ্ধ তীব্র আনন্দে বিশুদ্ধ বুদ্ধির তেজ যেন জলিয়া তীব্র হইয়া উঠে এবং তাহাতেই অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হইতে থাকে, সাধক পায় প্রাকৃত টানের সহিত যুদ্ধ করিবার, উপরে উঠিয়া চলিবার শক্তি। আনন্দ-মদিরায় সাধকের জ্ঞানময় পুরুষ জাগিয়া উঠে তাহার শতশক্তি লইয়া, সকল বাধা দীর্ণ করিয়া সাধককে সে লইয়া প্রতিষ্ঠিত করে পূর্ণতার সকল সিদ্ধির মধ্যে।

শেষ শ্লোকে দিব্য-মনপুরুষের স্বভাবের পরিচয় দেওয়া হইতেছে। এই দিব্য-মনপুরুষের মধ্যে আসিয়া ধরা দিয়াছে ভূমার বৃহৎ আনন্দ,

এবং ইহারই প্রেরণায় সাধক নির্ব্বিঘ্নে স্তর হইতে স্তরান্তরে, এক পার হইতে আর এক পারে—প্রকৃতির প্রাকৃত ভূমি হইতে দিব্য ভূমিতে উঠিয়া চলে।

বর্ত্তমান সূক্তে বৈদিক সাধনার একটা বিশেষত্ব আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। বৈদিক সাধনা শুধু ব্যক্তিগত সাধনা ছিল না, তাহা ছিল সঙ্ঘগত সাধনা। তাই আমরা প্রায়ই বৈদিক সাধকের মুখে শুনি তিনি তাঁহার সখাবৃন্দকে আহ্বান করিতেছেন,—সাধনায় মিলিয়া সমবেত শক্তি দিয়া দেবশক্তিকে নামাইবার জন্য। সাধনার সহচর ও সহায় যাহারা তাঁহাদের লইয়াই তখনকার গোষ্ঠী জীবন নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেবতারাও সাধনার সহচর ও সহায়, তাঁহাদিগকেও তাই সখা বলা হইত।

পঞ্চমং সূক্তং

আত্বেতা নিষীদতেন্দ্রমভি প্রগায়ত।

সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ ॥ ১ ॥

আ তু আ ইত (এখানেই নিকটে এস), নি সীদত (উপবেশন কর), ইন্দ্রং অভি (ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে, দিকে), প্রগায়ত (ওঠ গাহিয়া, উন্মুখী হইয়া গাও), সখায়ঃ (হে সখাবৃন্দ) স্তোমবাহসঃ (যাহার স্তোমের অর্থাৎ যে মন্ত্রে দেবতার স্থাপনা হয় তাহার বাহক)।

পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্য্যাণাং।

ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ॥ ২ ॥

ইন্দ্রং (সেই ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যিনি—পূর্ব্বশ্লোকের 'অভিপ্রগায়ত'এর সহিত অন্বয়) পুরূণাং (বহুল রূপ যাহাদের তাহাদের মধ্যে) পুরূতমং (সর্ব্বাপেক্ষা বহুলরূপ-ধারী), বার্য্যাণাং (বরণীয়, আকাঙ্খিত ধনরাজীর) ঈশানং (ঈশ্বর, বিধাতা), সচা (যুগপৎ বা সমবেতভাবে — সকল সোম একসঙ্গে অথবা তোমরা সকলে একসঙ্গে) সোমে সুতে (সোমরস পিষিয়া নিঙড়ান হইলে পর,—যখন সোমরস প্রস্তুত করা হইয়াছে) তখন তোমরা গাও অথবা তখনই ইন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত রূপ হয়।

পঞ্চম সূক্ত

হে সখাবৃন্দ! প্রতিষ্ঠার মন্ত্র বহিয়া লইয়া এস, এস এখানে। স্থিরাসনে উপবেশন কর। ইন্দ্রের দিকে চাহিয়া তোল তোমাদের গান ॥ ১ ॥

যাবতীয় বৈচিত্র্য লইয়া ইন্দ্র পরম বিচিত্র, সকল কাম্যের তিনি বিধাতাপুরুষ। একযোগে কর তবে রসের সৃষ্টি ॥ ২ ॥

স ঘা নো যোগ আ ভুবৎ স রায়ে স পুরন্ধ্যাং।
গমৎ বাজেভিরা স নঃ ॥ ৩ ॥

সঃ ঘ (তিনিই) আভুবৎ (যেন হইয়া বা গড়িয়া উঠেন) নঃ (আমাদের) যোগে (প্রাপ্তিতে, যাহা যাহা লাভ করিতেছি তাহাতে), সঃ [আভুবৎ] রায়ে (সার্থকতার আনন্দে) সঃ [আভুবৎ] পুরন্ধ্যাং (পুরু+ধীঃ—বহুল বুদ্ধির মধ্যে) সঃ নঃ বাজেভিঃ (আমাদের পূর্ণতা, ঋদ্ধিরাজীর সহিত) আগমৎ (যেন আসেন)।

যস্য সংস্থে ন বৃণ্বতে হরী সমৎসু শত্রবঃ।
তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ৪ ॥

সমৎসু (সকল সংগ্রামে) যস্য (যাঁহার) সংস্থে (আক্রমণের মুখে) শত্রবঃ (শত্রুরা) হরী (অশ্বদ্বয়কে) ন বৃণ্বতে (প্রতিহত করিতে পারে না) তস্মা ইন্দ্রায় (সেই ইন্দ্রের প্রতি) গায়ত। হরি=জ্যোতি।

সুতপাব্নে সুতা ইমে শুচয়ো যন্তি বীতয়ে।
সোমাসো দধ্যাশিরঃ ॥ ৫ ॥

ইমে (এই সব) শুচয়ঃ (বিশুদ্ধ) দধ্যাশিরঃ (দধিমিশ্রিত—দধি যাহার 'আশী' অর্থাৎ দোষনাশক, সোমরসের উগ্রতা নষ্ট করিতেছে বলিয়া—সায়ণ) সুতাঃ সোমাসঃ (অভিষুত সোমসকল) সুতপাব্নে (সোমপায়ীর উদ্দেশ্যে) বীতয়ে (উপভোগের জন্য) যন্তি (যাইতেছে)।

'দধি' ঠিক কি বুঝায় বলা কঠিন, তবে কথাটির ধাতুগত অর্থ 'ধারণ করে যাহা', আর দধি তৈয়ারি হয় গোদুগ্ধ অর্থাৎ গো হইতে দুহিয়া লওয়া হয় যাহা তাহা হইতে, তাই বোধ হয় দধি=স্নিগ্ধ গাঢ় সমর্থ যে জ্যোতি।

আমরা যাহা কিছু অধিগত করি, তাহাতে তিনি যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠেন। তিনিই মূর্ত্ত হইয়া উঠেন যেন আমাদের আনন্দ সম্পদে, আমাদের বহুল বুদ্ধিতে। তিনিই যেন আসেন আমাদের জন্য সকল পূর্ণ ঋদ্ধি লইয়া ॥ ৩ ॥

যাঁহার আক্রমণ-বেগের মুখে শক্ররা কোন সংগ্রামে জ্যোতির্ম্ময় অশ্বযুগলকে প্রতিহত করিতে পারে না, গাও সেই ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ॥ ৪ ॥

স্নিগ্ধ গাঢ় জ্যোতির মিশ্রণে বিশুদ্ধ করা হইয়াছে এই সব রসায়িত সোমধারা —সোমপায়ীর ভোগের জন্য তাহারা বহিয়া চলিয়াছে ॥ ৫ ॥

ত্বং সুতস্য পীতয়ে সদ্যো বৃদ্ধো অজায়থাঃ।
ইন্দ্র জ্যৈষ্ঠায় সুক্রতো ॥ ৬ ॥

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র!) সুক্রতো (হে সিদ্ধ কর্ম্মশক্তি!), ত্বং জ্যৈষ্ঠায় (জ্যেষ্ঠ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অগ্রণী, সকলের উপরে হইবার জন্য) সুতস্য পীতয়ে (সোমধারা পান করিতে ; সদ্যঃ (অবিলম্বে) বৃদ্ধঃ (বর্দ্ধিত হইয়াই) অজায়থাঃ (জন্মিয়াছিলে)।

আ ত্বা বিশন্ত্বাশবঃ সোমাস ইন্দ্র গির্বণঃ।
শন্তে সন্তু প্রচেতসে ॥ ৭ ॥

গির্বণঃ (গিঃ অর্থাৎ সত্যকে প্রকাশ করে যে বাক্ তাহাতে 'বন' অর্থাৎ আনন্দ, তৃপ্তি যাহার সেই তুমি) ইন্দ্র! আশবঃ (তীব্র, বেগবান) সোমাসঃ ত্বা (তোমাতে) আ বিশন্তি (যাইয়া প্রবেশ করিতেছে)। তে (তাহারা) প্রচেতসে (প্রজ্ঞাবানের অর্থাৎ ইন্দ্রের জন্যে), শং (আনন্দময়, কল্যাণপ্রসন্ন) সন্তু (হউক)।

ত্বাং স্তোমা অবীবৃধন্ ত্বামুক্থা শতক্রতো।
ত্বাং বর্দ্ধন্তু নো গিরঃ ॥ ৮ ॥

শতক্রতো! স্তোমাঃ (যে মন্ত্র সত্যকে স্থাপন করে তাহারা) ত্বাং (তোমাকে) অবীবৃধন্ (বর্দ্ধিত করিয়াছিল), উক্থাঃ (যে মন্ত্র সত্যকে উচ্চারিত বা স্ফুট করে তাহারাও) ত্বাং (তোমাকেই), [অবীবৃধন্], নঃ গিরঃ (আমাদের গির্ব্বাণী সমুদয়) ত্বাং বর্দ্ধন্তু (যেন তোমাকেই বর্দ্ধিত করে)।

হে ইন্দ্র! অমৃত রসায়ন পান করিবার জন্য জন্মিয়াই তুমি লাভ করিলে পূর্ণ পরিণতি। হে সিদ্ধকর্ম্মী! তুমি যে হইতে চাও সকলের জ্যেষ্ঠ ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র! প্রকাশের মন্ত্রে তোমার আনন্দ। তীব্র রসধারা সব তাই তোমাতেই প্রবেশ করিতেছে। তোমার প্রজ্ঞানকে তাহারা যেন কল্যাণ-প্রসন্ন করিয়া তোলে ॥ ৭ ॥

সত্যের প্রতিষ্ঠা যে বাণী, সত্যের পরিস্ফুরণ যে বাণী তাহাও তোমাকেই বর্দ্ধিত করিতেছে। হে শতকর্ম্মী! আমাদের সকল প্রকাশের বাণী যেন তোমাকেই বর্দ্ধিত করে ॥ ৮ ॥

অক্ষিতোতিঃ সনেদিমং বাজমিন্দ্রঃ সহস্রিণং।
যস্মিন্ বিশ্বানি পৌংস্যা ॥ ৯ ॥

যস্মিন (যাহার মধ্যে) বিশ্বানি (যাবতীয়) পৌংস্যা (পুরুষ শক্তি) [সেই] ইমং (এই) সহস্রিণং (সহস্রধা—'শত' ও 'সহস্র' বৈচিত্র্য ও পূর্ণতা বুঝায়) বাজং (পূর্ণ ঋদ্ধিকে) অক্ষিতোতিঃ ('অক্ষিত' অক্ষয়, 'উতি' কুশল যাহার সেই) ইন্দ্রঃ সনেৎ (যেন জয়, অধিকার করে)।

পুরুষ-শক্তি (পৌংস্যা, নৃ) ও স্ত্রী-শক্তি (গ্না) দেবতার এই দুই রকম শক্তি।

মা নো মর্ত্তা অভিদ্রুহন্ তনূনামিন্দ্র গির্বণঃ।
ঈশানো যবয়া বধং ॥ ১০ ॥

[হে] গির্বণঃ ইন্দ্র! নঃ মর্ত্তাঃ (আমাদের মৃত্যুর শক্তি সকল—অমৃতত্বের বিরোধী যাহারা) তনূনাং (সত্যের যত দেহ, বাস্তব বিগ্রহ বা রূপ তাহাদিগকে) মা অভিদ্রুহন্ (অসিয়া পড়িয়া যেন আক্রমণ, আহত না করে)। ঈশানঃ (হে শক্তিময় প্রভু) বধং (আঘাতকে, আক্রমণকে) যবয় (বিদীর্ণ কর, দূর কর)।

তাঁহার অখণ্ড কুশল লইয়া ইন্দ্র যেন জয় করেন এই সহস্রধা পূর্ণতা—ইহারই মধ্যে রহিয়াছে যাবতীয় পুরুষ-শক্তি ॥ ৯ ॥

মৃত্যুর শক্তি যেন আমাদের রূপায়নের উপর আসিয়া না পড়ে। হে ইন্দ্র ! সত্যেরই প্রকাশে তোমার আনন্দ। হে সর্ব্বশক্তিমান্ ! ব্যহত কর সকল আক্রমণ ॥ ১০ ॥

বর্ত্তমান সূক্তেও বলা হইতেছে, শুদ্ধ আনন্দের সহায়ে সকল মর্ত্ত্যশক্তিকে জয় করিয়া লাভ করিতে হইবে শুদ্ধ মনের মধ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা, শক্তির জ্ঞানের কল্যাণের মূর্ত্ত-প্রকাশ—ইন্দ্রের বহুবিচিত্র পূর্ণতা।

সৃষ্টির বৈচিত্র্য একটা গভীর সত্য—সাধককেও এই বহুভঙ্গিম লীলা আধারে ও প্রতিষ্ঠানে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। রূপের যে বহুলত্ব তাহা জাগ্রতে দেখা দিতেছে মনের ভিতর দিয়া। সত্য মনপুরুষ জাগিলেই রূপায়ন সব তাহাদের খণ্ড মর্ত্ত্যভাব দূর করিয়া অমৃতময়, সত্যেরই মূর্চ্ছনা ব্যঞ্জনা হইয়া দেখা দেয়। এই মনপুরুষ বা ইন্দ্রকে তাই বলা হইয়াছে 'পুরূতমং পুরূণাং'—ইন্দ্রের যে বহুবিধরূপ এমন আর কাহারও বা কিছুরই নাই, কারণ সকল বহুলত্বের গোড়াই হইতেছে তিনি। ইন্দ্র তাই আসিতেছেন 'বাজেভিঃ', তিনি জয় করিতেছেন সাধকের জন্য 'সহস্রিণং বাজং'। 'বাজ' হইতেছে অখণ্ড ঋদ্ধ যে পূর্ণতা, ইহা 'সহস্রিণং' অর্থাৎ সৃষ্টির সহস্রধারার আধার। ইন্দ্র হইতেছেন সকলের জ্যেষ্ঠ, কারণ বাহিরের যে রূপসৃষ্টি তাহার আদিরূপ প্রথম দেখা দেয় মন-পুরুষেরই অন্তরে, পরে তাহা ক্রমে বাহিরে মূর্ত্ত হইতে থাকে। ইন্দ্র জন্মিয়াই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইতে চাহেন—অর্থাৎ সাধকের মধ্যে যে মুহূর্ত্তে শুদ্ধ মন-পুরুষ জাগে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে সেই মনপুরুষই তাহার সাধনার, নূতন সৃষ্টির নিয়ন্তা হইয়া উঠে। সুতরাং ইন্দ্রই 'ঈশানং'—কর্ত্তা, তিনি 'সুক্রতু'—কর্ম্মের সিদ্ধশক্তি, তাঁহার মধ্যেই 'বিশ্বানি পৌংস্যা'—সকল পুরুষ-শক্তি; কারণ পুরুষেরই ইচ্ছানুসারে প্রকৃতির রূপ সব গড়িয়া উঠে। ইন্দ্র সাধকের যে আধার ও প্রতিষ্ঠান

নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতেছেন (পূর্ব্বসূক্তের 'সুরূপকৃত্নুং') তাহা সত্যের উপর, জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শুদ্ধ মনপুরুষ হইতেছেন 'প্রচেতস্', প্রজ্ঞানবান—প্রজ্ঞান অর্থ সেই জ্ঞান যাহা বস্তুকে জ্ঞাতার সম্মুখে ফুটাইয়া ধরিতেছে। ইন্দ্রের এই জ্ঞান বহুমুখী—প্রত্যেক বস্তুর, প্রত্যেক ভঙ্গীর যে নিভৃত সত্য সেই সমস্তকে সামঞ্জস্যের মধ্যে ধরিয়াই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, তাই তিনি 'পুরন্ধি' বা 'পুরুধী' অর্থাৎ বহুল বুদ্ধি দিয়া গড়া যেন একটি পুরী। ইন্দ্র চাহিতেছেন 'একং সৎ'-এর মধ্যে লয় নয়, কিন্তু বহুল প্রকাশ, প্রকাশেই তাঁহার আনন্দ, তিনি চান সত্যের মুখর মূর্চ্ছনা—'গির্ব্বণঃ'; সত্যের মধ্যে ইন্দ্রের আনন্দ—তাই সে আনন্দ বিশুদ্ধ প্রশান্ত অথচ তীব্র শক্তিমান। সাধারণ মানুষের যে ভোগের আনন্দ তাহা চঞ্চল উদ্বেল আবেগপূর্ণ, তাহাকে মানুষ ধারণ করিতে পারে না বা তাহার উপর সাধক কিছু গড়িতে পারে না—তাহা উপছিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে, মানুষ তাহাতে আপনাহারা হইয়া যাইতেছে। সেইজন্য এই ইন্দ্রিয়গত আনন্দকে শুদ্ধ (শুচয়ঃ) স্নিগ্ধ ধারণক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে শুদ্ধমনের, শুদ্ধবুদ্ধির, জ্ঞানের আলোকে (দধ্যাশিরঃ)। তবেই সেই আনন্দ হইবে কল্যাণময়, কার্য্যক্ষম, ফলপ্রসূ। এই আনন্দে অমৃতময়, শুদ্ধ মন-পুরুষ যখন শুদ্ধ প্রাণ-শক্তিকে ভর করিয়া জ্ঞানের ও শক্তির দুই জ্যোতির্ময় অশ্ব ছুটাইয়া চলেন সাধন যুদ্ধে, তখন অজ্ঞানের জড়শক্তি সব আর দাঁড়াইতে পারে না। পার্থিব চেতনার যত খণ্ডতা, মৃত্যুর যত শক্তি তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া ইন্দ্র সাধকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন পরিপূর্ণ অমৃতসিদ্ধি, অনন্ত চেতনার অখণ্ড অক্ষত বিস্তারের মধ্যে ফুটাইয়া তুলেন সাধকের সকল রূপ-সৃষ্টি।

ষষ্ঠং সূক্তং

যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি ॥ ১ ॥

পরি তস্থুষঃ (চারিদিকে যাহারা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহারা) ব্রধ্নং (প্রশস্ত) অরুষং (প্রদীপ্ত) চরন্তং (সচল) [রথকে] যুঞ্জন্তি (সংযোজনা করিতেছে)। দিবি (স্বর্গে) রোচনা (জ্যোতির্ময় লোকসকল) রোচন্তে (জ্বলিতেছে)।

যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে।
শোণা ধৃষ্ণু নৃবাহসা ॥ ২ ॥

নৃবাহসা (দেবপুরুষের বাহক) [অর্থাৎ পরিতস্থুষঃ] রথে (রথে, অর্থাৎ রথের) বিপক্ষসা (বিভিন্ন পার্শ্বস্থ) অস্য (ইঁহার, ইন্দ্রের) কাম্যা (বরণীয়, প্রিয়) শোণা (রক্তবর্ণ), ধৃষ্ণু (পরাক্রমী, উগ্র), হরী (অশ্বদ্বয়কে) যুঞ্জন্তি।

কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে।
সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥ ৩ ॥

মর্য্যাঃ (শক্তিমানেরা, 'মর্য্' অর্থাৎ বলশালী মরুৎগণ) অকেতবে (অজ্ঞানীর জন্য) কেতুং (জ্ঞান, যথাযথ দৃষ্টি), অপেশসে (অরূপের জন্য) পেশঃ (রূপ) কৃণ্বন্ (সৃষ্টি করিয়াছিল)। সংউষদ্ভিঃ (তাহাদের সকল উদয়, উন্মেষ বা প্রকাশের সাথে সাথে) অজায়থাঃ (তুমি অর্থাৎ ইন্দ্র, জন্ম লইয়াছিলে)।

ষষ্ঠ সূক্ত

প্রশস্ত প্রদীপ্ত যে রথখানি চলিয়াছে তাহাকে সংযোজন করিয়াছে, তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া আছে যাহারা— দ্যুলোকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে উজ্জ্বল ভুবনরাজী ॥ ১ ॥

তাহারাই রথে উভয় পাশে সংযোজন করিয়াছে, দেব-পুরুষকে বহিয়া লইয়াছে যে রক্তবর্ণ তেজস্বী তাঁহার প্রিয় অশ্বযুগল ॥ ২ ॥

শক্তিমানেরা অজ্ঞানীর জন্য জ্ঞান, অরূপের জন্য রূপ গড়িয়া দিয়াছেন। তাহাদের প্রতি-উন্মেষের সাথে সাথে তুমিও জন্ম লইয়াছ ॥ ৩ ॥

আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে।
দধানা নাম যজ্ঞিয়ং ॥ ৪ ॥

আৎঅহ (তারপরেই) [মরুতেরা] যজ্ঞিয়ং (যজ্ঞসম্বন্ধীয় অর্থাৎ দিব্য) নাম (নাম) দধানাঃ (ধারণ করিয়া), অনু স্বধাং (আপন প্রকৃতি, স্বধর্ম অনুসারে) পুনঃ (আবার) গর্ভত্বং (গর্ভাকার, ভ্রূণাবস্থা) এরিরে (লাভ করিল, পাইল)।

বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ।
অবিন্দ উস্রিয়া অনু ॥ ৫ ॥

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র), বীলু চিৎ (দৃঢ়কেও, কঠিন স্থানকেও) আ রুজত্নুভিঃ (ভাঙ্গিয়া ফেলে যাহারা তাহাদের সহায়ে), গুহা চিৎ (গুপ্তকেও, লুক্কায়িত বস্তুকেও) বহ্নিভিঃ (বহিয়া লইয়া চলে যাহারা তাহাদের সহায়ে)—অর্থাৎ মরুৎগণের সহায়ে—উস্রিয়াঃ (জ্যোতিরাজীকে) অনু অবিন্দ (অনুসরণ করিয়া তুমি আবিষ্কার করিয়াছিলে)।

দেবয়ন্তো যথা মতিমচ্ছা বিদদ্বসুং গিরঃ।
মহামনূষত শ্রুতং ॥ ৬ ॥

বিদৎ বসুং (সারবস্তুকে বা সত্য-সত্তাকে আবিষ্কার বা অধিকার করিতেছে যে সেই) মতিং (চিন্তাবৃত্তি) অচ্ছা (লক্ষ্য করিয়া—অভিমুখে, প্রতি) দেবয়ন্তঃ যথা (দেবত্ব-অভিলাষীর মত, দেবত্বপ্রয়াসী হইয়াই যেন) গিরঃ (সত্য বাক্ সকল) মহাং (এক মহান্) শ্রুতং (শ্রুতিমানকে,—যাঁহাকে শোনা যায়, দিব্যশ্রুতিতে ধরা যায় অথবা যাঁহার দিব্যশ্রুতি তাঁহাকে অর্থাৎ ইন্দ্রকে—শ্রুতি অর্থ জ্ঞানের বাঙ্ময় অনুপ্রেরণা) অনূষত (ঘোষণা করিয়াছিল, শব্দায়িত, প্রস্ফুট করিয়াছিল)।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সায়ণ মতে 'মতি' অর্থ মন্তা, মনন করেন যিনি অর্থাৎ ইন্দ্র।

দিব্যনাম ধারণ করিয়া আবার তাহারা তখনই আপন স্বধর্ম্মের বশে গর্ভে গিয়া প্রবেশ করিতেছে ॥ ৪ ॥

যাহারা দৃঢ়কে পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করে, গুহ্যকে বহিয়া চলে তাহাদেরই সহায়ে, হে ইন্দ্র! তুমি জ্যোতির্ম্ময় গোযূথ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছ ॥ ৫ ॥

সত্যবাক্ যত তাহারা মহান্ সে দিব্য-শ্রোতাকে প্রস্ফুট করিতেছে; দেবত্বের অভিলাষী হইয়া যেন তাহারা চাহিতেছে সার বস্তুকে অধিকার করে যে মানস সত্তা ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সংজগ্মানো অবিভ্যুষা।
মন্দূ সমানবর্চসা ॥ ৭ ॥

হি (কারণ, যেহেতু) ইন্দ্রেণ (ইন্দ্রের সহিত) সংদৃক্ষসে (এক সঙ্গে তোমাকে—মরুদগণকে—দেখা যাইতেছে), [সেই] অবিভ্যুষা (নির্ভীকের, অর্থাৎ ইন্দ্রের সহিত) সংজগ্মানঃ (যখন তুমি একসঙ্গে চলিতে থাক), [তোমরা উভয়ে] মন্দূ (হর্ষময়), সমান বর্চসা (তুল্য দীপ্তিশালী)।

অনবদ্যৈরভিদ্যুভির্মখঃ সহস্বদর্চতি।
গণৈরিন্দ্রস্য কাম্যৈঃ ॥ ৮ ॥

মখঃ (পূর্ণযজ্ঞ) ইন্দ্রস্য (ইন্দ্রের) অনবদ্যৈঃ (নির্দোষ, নিখুঁৎ) অভিদ্যুভিঃ (তদভিমুখে প্রদীপ্ত, তাঁহার উপরে জ্যোতি ঢালিয়া দিতেছে যাহারা সেই) কাম্যৈঃ (প্রিয়) গণৈঃ (অনুচর সকলের, বাহিনীর অর্থাৎ মরুৎগণের সহায়ে) সহস্বৎ (সবলে, সতেজে) অর্চতি (ঋক্ বা জ্যোতির্ম্ময় মন্ত্রকে উচ্চারিত করিতেছে)।

অতঃ পরিজ্মন্নাগহি দিবো বা রোচনাদধি।
সমস্মিন্নৃঞ্জতে গিরঃ ॥ ৯ ॥

পরিজ্মন্ (হে সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ ইন্দ্র), অতঃ (সেখান হইতে অর্থাৎ স্বর্লোক বা তুরীয় লোক হইতে) বা (অথবা) দিবঃ (স্বর্গের, দ্যুলোকের, শুদ্ধমানসলোকের) অধিরোচনাৎ (জ্যোতির্ম্ময় ভুবনের উপর হইতে) আগহি (এস)। অস্মিন্ (ইঁহার অর্থাৎ ইন্দ্রের মধ্যে) গিরঃ (প্রকাশের বাক্ সকল) ঋঞ্জতে (উজ্জ্বল, দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে)।

ইন্দ্রের সাথে যুগপৎ তোমাদিগকেও দেখা যাইতেছে, সেই নির্ভীকের সহিত একসাথে তোমরা চলিয়াছ। উভয়েই তোমরা আনন্দময়, সমান তোমাদের জ্ঞানপ্রভা ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রের যে প্রিয় শক্তিবাহিনী সম্মুখ হইতে তাঁহাকে নির্দ্দোষভাবে দীপ্ত করিয়া ধরিয়াছে, তাহার সহায়ে যজ্ঞ সতেজে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে জ্যোতির্ম্ময় মন্ত্র ॥ ৮ ॥

এস সেখান হইতে, হে সর্ব্বগামী! এস বা স্বর্গেরই জ্যোতির্ম্ময় ভুবন হইতে। তোমারই মধ্যে সকল বাণী প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৯ ॥

ইতো বা সাতিমীমহে দিবো বা পার্থিবাদধি ।
ইন্দ্রং মহো বা রজসঃ ॥ ১০ ॥

ইতঃ বা (এখান হইতে, এই পৃথিবী লোক হইতে হউক) বা (কিম্বা) দিবঃ (স্বর্গের) পার্থিবাৎ অধি (পৃথিবীর উপরে হউক) সাতিং (লভ্য) ঈমহে (আমরা চাহিতেছি) বা (কিম্বা) মহঃ (মহান্, বিশাল) রজসঃ (মধ্যলোক, অন্তরীক্ষ হইতে) ইন্দ্রং (ইন্দ্রকে) [ঈমহে] ।

এখান হইতেই হউক, আর স্বর্গস্থ পৃথিবী হইতেই হউক, যাহা কিছু লাভ করিবার আমরা চাহিতেছি ; মহান্ অন্তরীক্ষ হইতেও চাহিতেছি ইন্দ্রকেই ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য

ইন্দ্রের যে অনুচর মরুৎগণ, তাহাদের সহায়ে ইন্দ্রশক্তির উদ্বোধনের কথা বলা হইতেছে। মরুতেরা কাহারা? পৌরাণিক একটি উপাখ্যানে আছে যে (দিতির) গর্ভস্থ বায়ুকে ইন্দ্রদেব উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করেন। অর্থাৎ মরুৎ হইতেছে ইন্দ্রের হাতে বায়ুর বিভক্তিকরণ, রূপান্তর-গ্রহণের ফল। আর আমরা জানি বায়ু হইতেছে প্রাণশক্তি ও ইন্দ্র হইতেছে দিব্য মনপুরুষ। দিতি অর্থ দ্বৈত-চেতনা, যেখানে নানাত্ব অর্থাৎ সৃষ্টি বা প্রকাশ; আর অদিতি অর্থ অদ্বৈত, অখণ্ড, অনন্ত চেতনা। সুতরাং মরুৎ হইতেছে প্রাণশক্তি হইতে উদ্ভূত, প্রাণশক্তির সহিত মিশ্রিত মনের বহুধা চিন্তাশক্তি। জীবনীশক্তির তরঙ্গ যখন উর্দ্ধে উঠিয়া, মনের মধ্যে যাইয়া সজাগ চিন্তার বিচিত্র ধারা রূপে পরিণত হয়, তখনই তাহা মরুৎ। মরুৎ-দেবতাকে ঋগ্বেদে সর্ব্বদাই ইন্দ্রের সহিত একসঙ্গে আহ্বান করা হয়, পূজা করা হয়। ইন্দ্র অর্থাৎ মন-পুরুষ ছাড়া মরুতের অর্থাৎ মনোবৃত্তির আসলে পৃথক সত্তা নাই।

(১) শুদ্ধ মনের প্রতিষ্ঠান হইতেছে একখানা রথ। রথ, সাধনার ক্রমগতির প্রতীক মাত্র, রথ অর্থই গতি। শুদ্ধমনে সাধনার গতি ক্রমেই সম্মুখে অগ্রসর হইয়া, উর্দ্ধে উঠিয়া চলিয়াছে। শুদ্ধমনের গতি উদার সুপ্রশস্ত—সেখানে খণ্ডতা অল্পতা নাই, তাহা উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় —জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত। শুদ্ধমনকে ঘিরিয়া আছে, তাহার

মধ্যে খেলিতেছে যত দিব্য চিন্তাশক্তি অর্থাৎ মরুৎ—এই মরুৎসঙ্ঘই মনের প্রগতিকে লক্ষ্যের দিকে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছে। তাই শুদ্ধমনের জ্যোতির্ম্ময়লোকে (দ্যুলোকে), কত জ্যোতির কত জ্ঞানের আয়তন সব ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে।

(২) সাধনার ক্রমগতি চলিয়াছে দুইটি শক্তির সমবেত টানে, সেই যুগল অশ্ব যাহারা ইন্দ্রশক্তিকে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। এই যুগল অশ্ব, একটি জ্ঞানের, আর একটি শক্তির প্রতীক। সাধকের জ্ঞান ও শক্তি যতই বাড়িতে থাকে, তাহার মধ্যে দিব্য মন-পুরুষও তেমনি আপন ধর্ম্ম লইয়া জাগিয়া উঠে। সেই জ্ঞান ও শক্তির যুগল ধারাকে সাধনমুখী করিয়া ধরিতেছে, শুদ্ধ চিন্তার বল বা মরুৎ।

(৩) যেখানে অজ্ঞান অন্ধকার সেখানে বিশুদ্ধ চিন্তার বলই জ্ঞানের আলোক ফুটাইয়া ধরিতেছে, জাগ্রত সত্যের সুষ্ঠু বিগ্রহ সব নির্ম্মাণ করিতেছে। এই দিব্য চিন্তারাজি যতই ফুটিয়া উঠিতে থাকে, সাধকের মধ্যে তাহার সত্যকার মনপুরুষও তেমনি জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ সজীব ও বাস্তব হইয়া উঠেন।

(৪) শুদ্ধ চিন্তাশক্তির স্বধর্ম্ম হইতেছে মন-পুরুষকে ক্রমশঃ প্রকট করা—মনপুরুষের মধ্যেই জীবের সত্য সত্তা ও সত্য ধর্ম্ম। শুদ্ধ চিন্তা-শক্তির নব নব উন্মেষে মনপুরুষও স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইয়া উঠে। শুদ্ধ চিন্তাশক্তি একবার বিকশিত হইয়া মন-পুরুষের একটা রূপ ফলাইয়া ধরে, আবার তাহা ডুবিয়া যায় সাধকের অন্তরে এবং পুনরায় সেখান হইতে নূতন রূপ ও নূতন সত্তা লইয়া বাহির হয়। এই রকমেই যজ্ঞের, সাধন-প্রগতির যে অধিষ্ঠাত্রী দেবশক্তি তাহাকে ধরিয়া প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে শুদ্ধ চিন্তাশক্তি। 'নাম' হইতেছে সত্যের স্ফুটশক্তি,

লাতিন ভাষায় যাহাকে বলে "Numen"। সাধনার ধারা চলে একটানা স্রোতে নয়, কিন্তু একবার তাহা আপনার মধ্যে আপনাকে গুটাইয়া লয়, চেতনার নিভৃত লোক হইতে নূতন সত্য লইয়া আবার আসে বাহিরে, এইরকম একটা লয় ও বিকাশের পারম্পর্য্যে। বৈদিক ঋষিরা এই কথাটিকেই বলিতেন এই ভাবে যে, রাত্রির পর উষা, উষার পর রাত্রি, আবার উষা বার বার দেখা দিয়া অনন্ত শ্রেণীতে চলিয়াছে, অনন্ত সত্যকে প্রকাশ করিয়া।

(৫) চেতনার নিভৃতে, রাত্রির মাঝে, কঠিন জড়সত্তার তলে লুকাইয়া আছে জ্ঞানের জ্যোতিরাজী। দিব্য মন-পুরুষই সেই গোযূথ-রূপী জ্যোতির অনুসরণে চলিয়া সেই দৃঢ় গুপ্ত অন্ধকার স্থান সকল দীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করেন, তিনিই উষাকে - জ্ঞানের উন্মেষকে—লইয়া আসেন জাগ্রতে।

(৬) ইন্দ্র যখন অজ্ঞান—তমঃ বিদীর্ণ করিয়া জ্যোতিরাজী প্রকট করেন, তখন কি হয়? বৃহৎ সত্যের মূর্ত্তবাণী দিব্য শ্রবণে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। সেই দিব্য বাণী সব কি রকমের? তাহারা দেবসত্তা, দেবস্বভাবকে লক্ষ্য করিয়া চলে, তাহারা সাধকের মধ্যে ডাকিয়া আনে এমন একটা শুদ্ধ মতি যেখানে আসিয়া ধরা দেয় সত্যের সার সত্তা (বিদৎবসুং)।

(৭) সেই শুদ্ধ দিব্য মনে প্রতিভাত হয় সত্তা মন-পুরুষ আর তাঁহার শুদ্ধ চিন্তাশক্তি অর্থাৎ ইন্দ্র ও মরুৎ।

(৮) ইন্দ্র হইতেছেন ভিতরের জ্ঞানময় আনন্দময় পুরুষ, আর মরুৎ হইতেছেন সেই পুরুষের লীলা-শক্তি। একদিকে শুদ্ধ মানসিক সত্তা

আর একদিকে সেই মানসিক সত্তা হইতে উঠিতেছে, বিকীর্ণ হইতেছে যে সব শুদ্ধ চিন্তা অনুভবরাজী, এই দুইএর সহযোগে সাধকের সাধন-যজ্ঞ তেজোময় পূর্ণতার আধার হইয়া উঠে (মখঃ সহস্বৎ অর্চ্চতি)।

(৯) সাধকের মধ্যে তখন দেখা দেয় চেতনার সকল স্তরের সকল ভুবনের বা লোকের সত্য ও ঐশ্বর্য্য। প্রথমতঃ তুরীয় বা মর্হলোকের পার হইতে আসে যে সত্য (অতঃ পরিজ্মন্)—উপনিষদে যাহাকে বলা হয় "অসৌ লোকঃ", তারপর শুদ্ধ মানসলোকে রূপ গ্রহণ করে যে সত্য।

(১০) কেবল শুদ্ধ মানসলোক নয়, শুদ্ধ মানসের আলোকে শুদ্ধ উদ্ভাসিত যে পৃথিবী অর্থাৎ জড় প্রতিষ্ঠান বা দেহ-চেতনা তাহারও সত্য দেখা দেয়, আবার বিরাট যে প্রাণময়—শুদ্ধ ভোগের শুদ্ধ কর্ম্মপ্রেরণার যে জগৎ, তাহারও সত্য সাধকের মধ্যে রূপ গ্রহণ করে। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যৌ আর স্বর্ অর্থাৎ দেহ, প্রাণ, মন ও মনের উপরে যে বৃহৎ সত্য সকলই মনোময় পুরুষ অধিকৃত এই মানুষের মধ্যে দিব্য স্বরূপ লইয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠে। দিব্য মনোময় পুরুষই ইন্দ্র, এবং ইন্দ্রই সত্য-প্রকাশের শক্তি (সমস্মিন্ ঋঞ্জতে গিরঃ)।

দ্রষ্টব্য—মধুচ্ছন্দার অবশিষ্ট কয়েকটি সূক্তই (১০ম অবধি) ইন্দ্র সম্বন্ধীয়। সুতরাং অতঃপর আর তাৎপর্য্যের তেমন প্রয়োজন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী যে কয়েকটি ইন্দ্র-সূক্তের (৪র্থ হইতে) তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে তাহারই সহায়ে পরবর্ত্তীগুলি সহজেই বোধগম্য হইবে আশা করি। যদি কোথাও প্রয়োজন হয় তবে ব্যাখ্যার মধ্যেই টিপ্পনী যৎ সামান্য দেওয়া যাইবে।

সপ্তমং সূক্তং

ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।
ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥ ১ ॥

গাথিনঃ (উদ্‌গাতা সকলে, সামগায়কেরা) ইন্দ্রং ইৎ (ইন্দ্রকেই) বৃহৎ (বৃহৎ ভাবে, বৃহতের ছন্দে অর্থাৎ ইন্দ্রের যাহাতে হয় বৃহৎ প্রকাশ) [ক্রিয়াপদ উহ্য— গায়ন্তি, গাহিতেছে], অর্কিণঃ (ঋক্‌মন্ত্রশালীগণ—ঋক্, অর্ক, অর্চ্চ=দীপ্তি, জ্যোতি) অর্কেভিঃ (ঋক্‌মন্ত্ররাজী দ্বারা) ইন্দ্রং [অর্চ্চন্তি, মন্ত্রদীপ্ত করিতেছে], বাণী (সত্যের স্ফুট বিগ্রহ যে বাক্ তাহা) ইন্দ্রং অনূষত (ইন্দ্রের অনুসরণে প্রকাশিত হইয়াছে)।

"অনূষত" শব্দটির ব্যুৎপত্তি একটু সন্দেহজনক। পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্তে (১।৬।৬) আমরা সায়ণের ব্যাখ্যা দিয়াছি। এখানে আর একটি ব্যাখ্যা আমরা দিলাম।

ইন্দ্র ইদ্ধর্য্যোঃ সচা সম্মিশ্ল আ বচোযুজা।
ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥ ২ ॥

বচোযুজা (সত্যবাণীর সহায়ে যাহাদিগকে সংযুক্ত করিতে বা বাঁধিতে হয় সেই) হর্য্যোঃ (জ্যোতির্ম্ময় অশ্বযুগলের, বিশুদ্ধ প্রাণশক্তির) সচা (সহিত) ইন্দ্রঃ ইৎ (ইন্দ্রই) আ (সম্যক্) সম্মিশ্লঃ (সম্মিলিত)—অথবা, সম্মিশ্লঃ (সম্মিলিত হইয়া) আ (আসিতেছেন—পূর্ণ ক্রিয়াপদের পরিবর্ত্তে কেবল উপসর্গ)। ইন্দ্রঃ [হইতেছেন] বজ্রী, হিরণ্যয়ঃ (হিরণ্ময়, জ্যোতির্ম্ময়)।

সপ্তম সূক্ত

ইন্দ্রকেই সামগায়কেরা বৃহৎছন্দে গাহিতেছে। ইন্দ্রকেই জ্ঞানদীপ্তেরা দীপ্তমন্ত্রে প্রদীপ্ত করিতেছে। ইন্দ্রেরই অনু-সরণে সত্যের বাণী স্ফুট হইয়া উঠিতেছে॥ ১॥

সত্যবাক্ যে তেজোময় অশ্বযুগল সংযোজন করিতেছে তাহাদের সহিত ইন্দ্রই সম্মিলিত হইয়া আছেন। ইন্দ্রই বজ্রধারী, ইন্দ্রই হিরণ্ময় জ্যোতি॥ ২॥

ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্য্যং রোহয়দ্দিবি।
বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রঃ দীর্ঘায় (সুদূর) চক্ষসে (দর্শনের জন্য) দিবি (দ্যুলোকে, স্বর্গে, বিশুদ্ধ মনোময় প্রতিষ্ঠানে) সূর্য্যং (সূর্য্যকে, তুরীয় বিজ্ঞানময় পুরুষকে) আরোহয়ৎ (আরূঢ় করাইলেন), গোভিঃ (জ্ঞান-রশ্মির সাথে সাথে) অদ্রিং (পাহাড়কে, স্থূল-চেতনার কঠিন আয়তনকে) বি ঐরয়ৎ (বিদীর্ণ করিয়া ছড়াইয়া দিলেন)।

ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্র প্রধনেষু চ।
উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র), বাজেষু (সকল ঋদ্ধির মধ্যে) চ (এবং) সহস্র প্রধনেষু (সহস্র-ধারা-সম্পন্ন সকল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে) নঃ (আমাদিগকে) অব (পরিপোষণ কর)। উগ্রাভিঃ (সকল উগ্র, তেজোময়) উতিভিঃ (কুশল, স্বস্তি লইয়া) [তুমি] উগ্রঃ।

ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে।
যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণং ॥ ৫ ॥

বয়ং (আমরা) ইন্দ্রং (ইন্দ্রকে) মহাধনে (মহা ঐশ্বর্য্যে, আমাদের ঐশ্বর্য্য যখন বিপুল) [হবামহে—ডাকিতেছি] ইন্দ্রং (ইন্দ্রকেই) অর্ভে (অল্পে, অল্প ঐশ্বর্য্যে) হবামহে, [যিনি] বৃত্রেষু (বৃত্রদিগের, তামসশক্তি সকলের বিরুদ্ধে) বজ্রিণং (বজ্রধারী) যুজং (সখা, সহায়)।

দূরদৃষ্টির জন্য ইন্দ্রই সূর্য্যকে দ্যুলোকে উঠাইয়া ধরিয়াছেন, পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া সাথে সাথে জ্যোতিরাজী ছড়াইয়া দিয়াছেন ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র! সকল ঋদ্ধির মধ্যে, সহস্রধা ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আমাদিগকে পরিপুষ্ট করিয়া তোল। হে তেজস্বী! তেজোময় তোমার স্বস্তি ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রকেই আমরা ডাকিতেছি, আমাদের ঐশ্বর্য্য বিপুল হউক আর অল্পই হউক। সেই বজ্রী বৃত্রশক্তিদের বিরুদ্ধে আমাদের সাথী ॥ ৫ ॥

স নো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপাবৃধি।
অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ৬ ॥

সঃ (সেই) সত্রাদাবন্ (হে সতত দানশীল) নঃ বৃষন্ (আমাদের বৃষ, পুরুষ ; বর্ষণ, সিঞ্চন করিতেছেন যিনি) অমুং (ঐ) চরুং (সঞ্চরণী শক্তিকে, যাহা চলিয়া বেড়াইতেছে) অপাবৃধি (বিদীর্ণ করিয়া দূরে ফেল), [নিম্নে তুমি] অস্মভ্যং (আমাদের প্রতি) অপ্রতিষ্কুতঃ (অনাবৃত হইয়া—লাতিন ১cutum=ঢাল, আবরণ)

তুঞ্জে তুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ।
ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিং ॥ ৭ ॥

বজ্রিণঃ ইন্দ্রস্য (বজ্রী ইন্দ্রের) যে (যে সকল) তুঞ্জে তুঞ্জে (স্তরে স্তরে, অধিক হইতে অধিকতর শক্তিমান বা বেগবান) উত্তরে (উচ্চতর) স্তোমাঃ (প্রতিষ্ঠামন্ত্র) [রহিয়াছে], অস্য (ইঁহার, ইন্দ্রের) সুষ্টুতিং (সম্যক বা পূর্ণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র) ন বিন্ধে (আমি লাভ করি নাই)।

বৃষা যূথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্ত্যোজসা।
ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ৮ ॥

বৃষা (বৃষ) ওজসা (বীর্য্যভরে) বংসগঃ (আনন্দগামী, আনন্দের জন্য যায়) যূথা ইব (যেমন যূথের প্রতি) [তেমনি] ঈশানঃ (সর্ব্বশক্তিমান, আপন ঈশ্বরত্বের ভরে ইন্দ্র) অপ্রতিষ্কুতঃ (অনাবৃত, পূর্ণ প্রকট হইয়া) কৃষ্টীঃ (কৃত বা সিদ্ধ কর্ম্মীদের প্রতি) ইয়র্ত্তি (ছুটিয়া চলেন, সবেগে ধাবন করেন)।

'বৃষ' 'বংসগঃ', 'ওজসা' ঈশান অর্থাৎ ইন্দ্র পক্ষেও প্রযোজ্য। যূথ=গো যূথ=জ্যোতি সঙ্ঘ, কৃষ্টি পক্ষেও প্রযোজ্য।

তাই হে আমাদের নিত্যদাতা পুরুষবৃষ! বিদীর্ণ করিয়া দূরে ফেল ঐ সচল আবরণ। স্বয়ং তুমি আমাদের দিকে অনাবৃত হইয়া দাঁড়াও ॥ ৬ ॥

স্তরের পর স্তরে, ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে রহিয়াছে বজ্রধারী ইন্দ্রের সব প্রতিষ্ঠা মন্ত্র। তাঁহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র আমি পাইলাম না ॥ ৭ ॥

বৃষরাজ আনন্দের জন্য তেজোভরে চলে যেমন গোযূথের প্রতি, তেমনি এই সর্ব্বশক্তিময় পুরুষ আপনাকে অনাবৃত করিয়া সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন কর্ম্মীসঙ্ঘের প্রতি ॥ ৮ ॥

য একশ্চর্ষণীনাং বসূনামিরজ্যতি।
ইন্দ্রঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাং ॥ ৯ ॥

যঃ ইন্দ্রঃ (যে ইন্দ্র) একঃ (একাই) চর্ষণীনাং (কর্ম্ম সাধকদিগের উপর), বসূনাং (সকল সার সম্পদ, সত্য সত্তা, পরমার্থের উপর অথবা সত্যের অধিবাসী দেবতাদের উপর) পঞ্চ ক্ষিতীনাং (পঞ্চ অধিষ্ঠান বা লোকের উপর—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যৌ, স্বর্ ও পরম ব্যোম অর্থাৎ দেহ, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও সচ্চিদানন্দ) ইরজ্যতি (রাজত্ব করিতেছেন, জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছেন)।

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ।
অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥ ১০ ॥

বঃ (তোমাদের) জনেভ্যঃ (সকল জনের জন্য) পরিবিশ্বতঃ (সকল স্থানে, চেতনার প্রত্যেক ভূমি ঘিরিয়া) ইন্দ্রং হবামহে। [তিনি] কেবলঃ (একান্ত, নিঃশেষ ভাবে) অস্মাকং (আমাদের) অস্তু (হউন)।

এই এক ইন্দ্র সকল কর্ম্মসাধকদের, সকল দেবতা-বৃন্দের, পঞ্চলোকেরই উপর জ্যোতির্ম্ময় রাজা হইয়া প্রতিষ্ঠিত ॥ ৯ ॥

তোমাদের বিশ্বজনের জন্য আমরা সকল প্রতিষ্ঠানের উপর ইন্দ্রকে ডাকিয়া আনিতেছি। একান্তই তিনি আমাদের হউন ॥ ১০ ॥

অষ্টমং সূক্তং

এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহং।
বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর॥ ১ ॥

এন্দ্র (অ + ইন্দ্র, হে ইন্দ্র!—'আ' উপসর্গ 'ভর' ক্রিয়ার) উতয়ে (স্বস্তির জন্য) সানসিং (আহরণক্ষম, অধিকার করিয়া আনে যে) সজিত্বানং (জয়শীল) সদাসহং (সদা পরাভবকারী, নিত্য শক্তিমান) বর্ষিষ্ঠং (সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষণক্ষম, পরিপ্লাবী, প্রভূত, প্রচুর) রয়িং (সার্থকতা) আ ভর (এখানে বহিয়া আন)।

নি যেন মুষ্টিহত্যয়া নি বৃত্রা রুণধামহৈ।
ত্বোতাসো ন্যর্বতা॥ ২ ॥

যেন (যাহার দ্বারা—পূর্ব্বশ্লোকের 'রয়ি') মুষ্টিহত্যয়া (হনন বা অপহরণের শক্তির হননের সহায়ে, অর্থাৎ হনন বা অপহরণ করে যে তাহাকে নিহত করিয়া—মুষ্ ধাতু অর্থ হনন বা অপহরণ। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন 'মুষ্টি প্রহার দিয়া'), অর্ব্বতা (যুদ্ধমান অশ্ব অর্থাৎ প্রাণশক্তির সহায়ে—অর্=পরিশ্রম করা, যুদ্ধ করা) ত্বোতাসঃ (ত্বয়া উতাসঃ—তোমার দ্বারা স্বস্তিমান আমরা) বৃত্রা (বৃত্র সকলকে) নি রুণধামহৈ (যেন প্রতিহত করিতে পারি, হটাইয়া দিতে পারি। 'নি' নিশ্চয়ার্থে পুনরুক্তি।

'অশ্ব' হইতেছে মানুষের, 'হয়' দেবতার, আর 'অর্ব্বন্' অসুরের অশ্ব বা প্রাণশক্তি। আসুরিক শক্তিকে অনেক সময়ে আসুরিক শক্তি দিয়াই পরাভব করিতে হয়, তাই বর্ত্তমান শ্লোকে 'অর্ব্বন্'কে ডাকা হইয়াছে। প্রত্যেক দেবতারও আছে আবার নিজস্ব অশ্ব—প্রাণশক্তি হইতেছে কার্য্যকরা শক্তি, তাই প্রত্যেক দেবতার কর্ম্ম অনুসারে আছে বিশেষ বিশেষ অশ্ব। বায়ুর অশ্ব 'নিযুৎ', মরুৎদের 'পৃষতী', ইন্দ্রের 'হরি', অগ্নির 'দধিক্রা', সূর্য্যের 'এতশ'।

অষ্টম সূক্ত

হে ইন্দ্র! আমাদের স্বস্তির জন্য বহিয়া আন এখানে এমন সার্থকতা যাহা সকল অধিকারে অধিকারী, সকল জয়ে জয়ী, সর্ব্বদাই যাহা চলিয়াছে দারুণ বিক্রমে, ছুটিয়াছে সকল প্লাবিত করিয়া ॥ ১ ॥

যাহার প্রসাদে তস্করকে নিহত করিয়া, ক্ষাত্রবীর্য্যকে ধরিয়া, তোমাতে স্বস্তিমান আমরা বৃত্রবাহিনীকে প্রতিহত করিব, করিব, করিব ॥ ২ ॥

ইন্দ্র ত্বোতাস আ বয়ং বজ্রং ঘনা দদীমহি।
জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র), ত্বোতাসঃ বয়ং, বজ্রং (বজ্রকে) ঘনা (দৃঢ়ভাবে, অবিরত — অথবা, বজ্রের বিশেষণ) আদদীমহি (যেন গ্রহণ করি), যুধি (যুদ্ধে) স্পৃধঃ (প্রতিদ্বন্দ্বী সকলকে) সংজয়েম (যেন সম্যক জয় করি) ।

বয়ং শূরেভিরস্তৃভিরিন্দ্র ত্বয়া যুজা বয়ং।
সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র), অস্তৃভিঃ (সশস্ত্র) শূরেভিঃ (শূরদিগের সহায়ে) বয়ং, যুজা (সহচর) ত্বয়া (তোমার সহায়ে) বয়ং, পৃতন্যতঃ (যুদ্ধকামীদিগকে, যুদ্ধাভিলাষী সকলকে) সাসহ্যাম (যেন পরাভূত করিতে পারি) ।

মহাঁ ইন্দ্রঃ পরশ্চ নু মহিত্বমস্তু বজ্রিণে।
দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র) [হইতেছেন] মহান্ (বিরাট, বৃহৎ) পরশ্চ (পরঃ চ—এবং শ্রেষ্ঠ, সকলের উপরে) নু (তাই) বজ্রিণে (বজ্রধারীর জন্য) মহিত্বং (মহত্ত্ব) অস্তু (হয় যেন), শবঃ (তেজ, জ্যোতির্ময় শক্তি) প্রথিনা (বিস্তীর্ণ, প্রসারিত) দ্যৌঃ ন (স্বর্গের মত) [অস্তু বজ্রিণে] ।

'দ্যৌ' ইন্দ্রের লোক—বিশুদ্ধ মানস প্রতিষ্ঠান, যেখানে বৃহতের অর্থাৎ অতিমানসের জ্যোতি ও শক্তি ফুটিয়া দেখা দিয়াছে ।

হে ইন্দ্র! তোমাতে স্বস্তিমান আমরা যেন বজ্রকে নিরন্তর ধারণ করি, প্রতিদ্বন্দ্বী সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করি॥ ৩॥

সশস্ত্র বীরবৃন্দের সহায়ে, হে ইন্দ্র! যেন আমরা, তোমার সাহচর্য্যে যেন আমরা, যুদ্ধকামী যাহারা তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারি॥ ৪॥

বিরাট সেই ইন্দ্র, তিনিই শ্রেষ্ঠ। বিরাট হইয়াই উঠে যেন এই বজ্রী, দীপ্ত তেজ তাঁহার হয় যেন প্রসারিত স্বর্গেরই মত—॥ ৫॥

সমোহে বা য আশত নরস্তোকস্য সনিতৌ।
বিপ্রাসো বা ধিয়ায়বঃ ॥ ৬ ॥

[পূর্ব্বশ্লোকের সহিত অন্বয় রাখিতে হইবে—মহিত্বং অস্তু বজ্রিণে, কাহাদের উদ্দেশ্যে?]

যে নরঃ (যে শক্তিধর পুরুষেরা, পুরুষশক্তিসকল) সমোহে (সংগ্রামে) তোকস্য (সৃষ্ট বস্তুর, তাহারা যাহা যাহা সৃষ্টি করে তাহার) সনিতৌ (অধিকার-লাভে, জয় করিয়া) আশত (সিদ্ধিলাভ করিতেছে) বা বা (অথবা) [যাহারা] ধিয়ায়বঃ (ধীযুক্ত) বিপ্রাসঃ (জ্ঞানী)।

'সমোহ' ও 'তোক' কথা দুইটির ব্যুৎপত্তি অনিশ্চিত। সমোহ=সং+ওহ, বস্তু সমুচ্চয় অর্থাৎ সকল বস্তু যেখানে আসিয়া জড় হইয়াছে, এই অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে আমরা সায়ণের ব্যাখ্যাই অনুসরণ করিয়াছি। আর 'তোক' অর্থ সায়ণ বলিয়াছেন অপত্য। অপত্য বা তনয় অর্থ যাহা সৃষ্ট হইয়াছে। ঋগ্বেদে তনয় বা অপত্য একটা বিশেষ প্রতীক, তাহার অর্থ জীবপুরুষ বা জীবাত্মা। এখানে 'তোক' অর্থে সাধারণ ভাবে 'সৃষ্টি' লইয়াছি।

যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে ।
উর্ব্বীরাপো ন কাকুদঃ ॥ ৭ ॥

যঃ কুক্ষিঃ (যে উদর অর্থাৎ ইন্দ্রের অন্তরের আয়তন) সোমপাতমঃ (সর্ব্বাপেক্ষা সোমপায়ী) [তাহা] সমুদ্রঃ ইব (সমুদ্রের মত) পিন্বতে (ঢালিয়া দিতেছে—'পিব্', সেচনে) ন (যেন) কাকুদঃ (শিখরস্থ, উর্দ্ধপ্রদেশস্থ—'ককুদ'=শিখর) উর্ব্বীঃ (বিশাল, বিস্তীর্ণ,—বৃহতের, মহর্লোকের) আপঃ (জলরাশী)।

তাহাদেরই জন্য যাহারা শক্তিধর পুরুষ, যাহারা আপন আপন সৃষ্টিকে অধিকার করিয়া সংগ্রামে সিদ্ধিলাভ করিতেছে, যাহারা জ্ঞানদীপ্ত ধীযুক্ত ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রের যে উদর আনন্দ-অমৃতে পরিপূর্ণ, তাহা যেন কোন শিখরপ্রদেশ হইতে সমুদ্রের মত ঢালিয়া দিতেছে বৃহতের রসধারা ॥ ৭ ॥

এবা হ্যস্য সূনৃতা বিরপ্‌শী গোমতী মহী।
পক্বা শাখা ন দাশুষে ॥ ৮ ॥

এবা হি (এব হি—এই রকমেই, এই যে) অস্য (ইঁহার, ইন্দ্রের) বিরপ্‌শী (বিস্তৃত ভাবে স্রাবী, পরিস্রাবী, অজস্র) গোমতী (জ্যোতির্ম্ময়) মহী (বৃহৎ) সূনৃতা (সুখময় সত্য-প্রেরণা সকল) দাশুষে (দানকারীর কাছে, আত্মসমর্পণপরায়ণের জন্য) পক্বা (সুপক্ব, পক্বফলসমন্বিত) শাখা ন (শাখার মত) [হইয়াছে]।

এবা হি তে বিভূতয় ঊতয় ইন্দ্র মাবতে।
সদ্যশ্চিৎ সন্তি দাশুষে ॥ ৯ ॥

এবা হি, ইন্দ্র (হে ইন্দ্র) তে (তোমার) বিভূতয়ঃ (বিভূতি সকল—বি+ভূ বিস্তীর্ণভাবে বৃহৎভাবে 'হওয়া' বা রূপ গ্রহণ) [আর] ঊতয়ঃ, মাবতে (মৎ সদৃশ, আমার মতন) দাশুষে (প্রদাতার জন্য) সদ্যঃ চিৎ (সদ্য সদ্যই, অবিলম্বেই) সন্তি (হইতেছে অর্থাৎ সৃষ্ট হইতেছে)।

এবা হ্যস্য কাম্যা স্তোম উক্‌থং চ শংস্যা।
ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে ॥ ১০ ॥

এবা হি অস্য কাম্যা (প্রিয়) শংস্যা (প্রকাশিতব্য, অন্তরের মুখ ফুটিয়া যাহা বলিতে হইবে) স্তোম (প্রতিষ্ঠামন্ত্র ; 'সামসাধ্যমন্ত্র'—সায়ণ) উক্‌থং চ (আর প্রকাশমন্ত্র ; 'ঋকসাধ্যমন্ত্র'—সায়ণ), ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে (ইন্দ্রের সোমপানের জন্য)।

এই যে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় বৃহৎ সত্যপ্রেরণা সকল পরিপ্লাবী হইয়া—পক্কফলভারাবনত শাখারই মত, দান-পরায়ণের কাছে ধরা দিতেছে ॥ ৮ ॥

এই যে, ইন্দ্র! তোমার যত বিভূতি, তোমার যত স্বস্তি তাহা সদ্য সদ্য আমার মত যাজ্ঞিকেরই জন্য গড়িয়া উঠিতেছে ॥ ৯ ॥

এই ত তাঁহার প্রতিষ্ঠার মন্ত্র, প্রকাশের মন্ত্র—ইন্দ্র আনন্দ-রস পান করিবে, তাই উহাদিগকে স্ফুট করিয়া ধরিতে হইবে ॥ ১০ ॥

নবমং সূক্তং

ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্ব্বভিঃ।
মহাঁ অভিষ্টিরোজসা ॥ ১ ॥

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র!), এহি (এস)। অন্ধসঃ (অন্নের, তোমার অন্নরূপ এই আধারের ; অথবা আমাদের আহুতির) বিশ্বেভিঃ (সমুদয়, যত সকল) সোমপর্ব্বভিঃ (সোমরসের পর্ব্বের সহায়ে, ভাগে ভাগে যে আনন্দ তাহাদের সহায়ে—দেহ প্রাণ মন প্রভৃতি স্তরে স্তরে যত আনন্দধারা) মৎসি (আনন্দিত, তৃপ্ত হও)। ওজসা (ওজঃবলে, সংহত সামর্থ্যের সহায়ে) মহান্ (মহান্, বিরাট, বৃহৎ) [হইয়া তুমি] অভিষ্টি (ইষ্টলাভ, সিদ্ধিলাভ কর—অভি+ইষ্, যাইয়া প্রবেশ কর, লক্ষ্যে পৌছ)।

আধারের স্তরে স্তরে যত রকম রসানুভূতি আছে সে সকল বিশুদ্ধ মনোময় পুরুষের আনন্দের মধ্যে সমর্পণ করিতে হইবে, উঠাইয়া ধরিতে হইবে—তবেই পাওয়া যাইবে বৃহতের পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, জ্যোতি, শক্তি, জ্ঞান, প্রেরণা, অমৃতত্ব। বর্ত্তমান সূক্তের ইহাই মূল কথা।

নবম সূক্ত

এস, ইন্দ্র! আমাদের আহুতির পর্ব্বে পর্ব্বে যত রসধারা তাহাদের সকলের সহায়ে আনন্দ তুমি গ্রহণ কর। সংহত সামর্থ্যে বৃহৎ হইয়া ওঠ, ইষ্টকে অধিকার কর॥ ১॥

এমেনং সৃজতা সুতে মন্দিমিন্দ্রায় মন্দিনে।
চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে ॥ ২ ॥

সুতে (অভিসবনে, সোমপ্রস্তুত বা আহুতিকালে, সমর্পণের ফলে আধারের পর্ব্বে পর্ব্বে যখন দিব্য রসানুভূতি জাগিতে থাকে তখন) মন্দিনে (আনন্দময়, বা আনন্দকর), বিশ্বানি (সকল) চক্রয়ে (কর্ম্ম করিতেছেন যিনি সেই) ইন্দ্রায় (ইন্দ্রের জন্ম) মন্দিং (আনন্দকর), চক্রিং (কর্ম্মী, কর্ত্তা) ঈং এনং (ইহাকেই, সোম দেবতা বা দিব্যানন্দ-কেই,—অমৃতত্বকেই, 'ঈং' পাদপূরণে) আ সৃজত (উন্মুক্ত করিয়া ধর)। এমেনং—আ+ঈং+এনং। 'সৃজতা'র 'আ'কার ছন্দ বা সুরের অনুরোধে—এ প্রকার দীর্ঘীকরণ বেদে প্রায়ই পাওয়া যায়।

অমৃতত্বের আনন্দই রহিয়াছে সত্যমানসপুরুষের আনন্দের পিছনে, এই আনন্দের যে ক্রিয়াশক্তি তাহাই মানসপুরুষকে বিশ্বকর্ত্তা করিয়া ধরিয়াছে।

মৎস্বা সুশিপ্র মন্দিভিঃ স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণে।
সচৈষু সবনেষ্বা ॥ ৩ ॥

সুশিপ্র (হে নির্দ্দোষ হনু বা নাসাযুক্ত ! দস্যু বা অজ্ঞানের শক্তি সকলকে বলা হয় নাসিকা-হীন, "অনাস"—অথবা, দৃঢ় কবল যাহার অর্থাৎ ভোগ-সমর্থ, কর্ম্মসমর্থ; শক্তিমান) বিশ্বচর্ষণে (হে সকল-কর্ম্মী !) মন্দিভিঃ (আনন্দকর) স্তোমেভিঃ প্রতিষ্ঠামন্ত্রের সহায়ে) মৎস্ব (আনন্দমত্ত হও)। সচা (এক সঙ্গে, যুগপৎ) এষু (এই) সবনেষু (অভিসবন সকলের মধ্যে, সোমধারা সব যে প্রস্তুত হইতেছে বা আহুতি দেওয়া হইতেছে তাহাদের মধ্যে) আ (অর্থাৎ 'আ গচ্ছ', এস)। সোমের ত্রিবিধ সবন বা আহুতি—দেহে, প্রাণে, মনে।

রস প্রস্তুত—উন্মুক্ত করিয়া দাও আনন্দমত্ত ইন্দ্রের জন্য এই মাদকধারা, উন্মুক্ত করিয়া দাও বিশ্বকর্ম্মীর জন্য এই কর্ম্মীকে ॥ ২ ॥

হে সমর্থ! আনন্দপ্লাবী যত প্রতিষ্ঠামন্ত্র তাহাতে তুমি আনন্দপ্লুত হও। হে বিশ্বকর্ম্মী! এই যত রসধারা সৃষ্ট হইতেছে যুগপৎ তাহাদের সকলের মধ্যে তুমি আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হও ॥ ৩ ॥

অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত।
অজোষা বৃষভং পতিং ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র! তে (তোমার, তোমার জন্য) গিরঃ (সত্যবাক্ সকল, প্রকাশের মন্ত্ররাজী) অসৃগ্রং (=অসৃজং, আমি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি), অজোষাঃ (বিযুক্তা, তোমা-হারা) [তাহারা তাহাদের] বৃষভং (পুরুষ), পতিং (পতি) ত্বাং প্রতি (তোমার প্রতি) উদহাসত (উঠিয়া চলিয়াছে—উৎ+অহাসত, গত্যর্থ 'হা' ধাতু)।

'বৃষভ' শব্দে ইঙ্গিতে গীর্ব্বাক্যকে গোযূথের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বৃষহারা গোযূথ ধায় যেমন বৃষের প্রতি তেমনই ইত্যাদি। আর গো অর্থ জ্যোতি, সুতরাং গীর্ব্বাক্যও যে জ্যোতির্ম্ময় তাহাও বুঝাইতেছে।

'উদহাসত' বুঝাইতেছে সত্তার উর্দ্ধগমন—পরের শ্লোকের 'অর্ব্বাক'এর সহিত তুলনীয়। একদিকে সাধকের ভিতর সত্য বিকশিত হইয়া হইয়া উপরের দিকে চলিয়াছে, অন্যদিকে উপর হইতে দিব্য সত্য সাধকের ভিতরে নামিয়া আসিতেছে—এই দুই রকম গতির সহায়ে সাধকের ক্রমসিদ্ধি।

সংচোদয় চিত্রমর্বাগ্রাধ ইন্দ্র বরেণ্যং।
অসদিত্তে বিভু প্রভু ॥ ৫ ॥

ইন্দ্র! বরেণ্যং (বরেণ্য, প্রিয়, কাম্য) চিত্রং (বিচিত্র, বহুভঙ্গিম) রাধঃ (পরমা তুষ্টি) অর্ব্বাক্ (নিম্নাভিমুখে) সং চোদয় (সুষ্ঠুরূপে চালনা কর), [তাহা] তে ইৎ (তোমারই জন্য) অসৎ (যেন হয়) বিভু (বি+ভূ, সর্ব্বত্রব্যাপী) [এবং] প্রভু (প্র+ভূ, সম্মুখে প্রকট বিষয়ীভূত)।

'বিভু' এবং 'প্রভু' 'বিজ্ঞান' ও 'প্রজ্ঞানে'র সহিত তুলনীয়। সত্তার, জ্ঞানের বা আনন্দের দুই রূপ বা ধারা—এক, বিশ্বের সহিত, সকলের সহিত মিলিয়া গিয়া একীভূত হইয়া যাওয়ার ফলে যে সত্তা, জ্ঞান বা আনন্দ, আর বিশ্বকে সকলকে আপনা হইতে পৃথক করিয়া সম্মুখে বিষয়রূপে রাখিয়া যে রকম সত্তা, জ্ঞান বা আনন্দ হয়। বিষয়ী যখন বিষয়ের সহিত একীভূত হয়, আর বিষয়ী যখন বিষয় হইতে পৃথক থাকে—এই দুই বৈচিত্র্য লইয়াই সত্তার, জ্ঞানের, আনন্দের পূর্ণতা।

হে ইন্দ্র! তোমার প্রকাশের মন্ত্ররাজীও আমি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি। বিরহিণী তাহারা জ্যোতির যূথের মত উঠিয়া চলিয়াছে তাহাদের পুরুষ, তাহাদের পতি তোমারই অভিমুখে ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র! অধোদিকে চালিত কর সেই কাম্য, সেই বহুভঙ্গিম পরমাতুষ্টি। তোমারই জন্য হউক তাহা সর্ব্বব্যাপা, হউক তাহা সম্মুখে প্রকট ॥ ৫ ॥

অস্মান্ সু তত্র চোদয়েন্দ্র রায়ে রভস্বতঃ।
তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ ॥ ৬ ॥

তুবিদ্যুম্ন (বহুলজ্যোতির্ম্ময়) ইন্দ্র! তত্র (সেইখানে, 'বিভু' এবং 'প্রভু' যে 'রাধ' তাহার মধ্যে) রায়ে (পূর্ণ সার্থকতার জন্য) রভস্বতঃ (হর্ষান্বিত) যশস্বতঃ (জয়শ্রীযুক্ত) অস্মান্ (আমাদিগকে) সু (অভ্রান্তভাবে, যথাযথ) চোদয়।

সংগোমদিন্দ্র বাজবদস্মে পৃথু শ্রবো বৃহৎ।
বিশ্বায়ুর্ধেহ্যক্ষিতং ॥ ৭ ॥

ইন্দ্র! গোমৎ (জ্যোতির্ম্ময়), বাজবৎ (ঋদ্ধিময়, সকল ঐশ্বর্য্যশালী), বিশ্বায়ুঃ (বিশ্বপ্রাণরূপী), পৃথু (প্রসারিত, সর্ব্ববিষয়ী) বৃহৎ (বৃহৎ, মহর্লোকের, বিজ্ঞানময় লোকের) শ্রবঃ (দিব্য শ্রবণকে) অস্মে (আমাদের জন্য) সং ধেহি (সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত কর)।

অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহদ্দ্যুম্নং সহস্রসাতমং।
ইন্দ্র তা রথিনীরিষঃ ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র! বৃহৎ শ্রবঃ (বৃহৎ শ্রুতিকে), সহস্র-সাতমং (সহস্রকে, সমগ্র ঐশ্বর্য্যকে সম্পূর্ণ অধিকার করে যে সেই) দ্যুম্নং (জ্যোতিকে), [আর] তাঃ (সেই সকল) রথিনীঃ (বেগবতী, ক্ষিপ্রগামী) ইষঃ (প্রেরণাকে) অস্মে ধেহি। অথবা তাঃ (তাহারাই) [হইতেছে তোমার] রথিনীঃ ইষঃ—'ধেহি'র কর্ম্ম কেবল 'শ্রবঃ' ও 'দ্যুম্নং'।

হে ইন্দ্র ! আমাদিগকেও সেইখানে পূর্ণ সার্থকতার জন্য অভ্রান্তভাবে চালিত কর। হে বহুলজ্যোতির্ম্ময়। আমরা আনন্দরসিক, আমরা জয়শ্রীমণ্ডিত ॥ ৬ ॥

হে ইন্দ্র ! বৃহতের যে দিব্যশ্রুতি সর্ব্বব্যাপক, অখণ্ড-জীবনরূপী, যাহা অক্ষয়, জ্যোতির্ম্ময়, সকল ঋদ্ধিময় তাহা আমাদের মধ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ কর ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র ! দৃঢ় প্রতিষ্ঠ কর আমাদের মধ্যে বৃহতের দিব্যশ্রুতি, আর যে জ্যোতি সহস্রধা-ঐশ্বর্য্যকে পূর্ণভাবে অধিকার করিতেছে, আর সেই সব বেগবতী অনুপ্রেরণা ॥ ৮ ॥

বসোরিন্দ্রং বসুপতিং গীর্ভির্গৃণন্ত ঋগ্মিয়ং।
হোম গন্তারমূতয়ে ॥ ৯ ॥

গীর্ভিঃ (সত্য বাক্যের দ্বারা) গৃণন্তঃ (সত্যকে উচ্চারিত, প্রকট করে যাহারা) [সেই আমরা] হোম (আহ্বান করিতেছি) ইন্দ্রং (ইন্দ্রকে) [যিনি] বসোঃ (বস্তুর, সত্য সত্তার) বসুপতি (যে বস্তু তাহার অধিপতি), ঋগ্মিয়ং (ঋক্‌ময়), উতয়ে (স্বস্তির জন্য) গন্তারং (যিনি চলিয়াছেন)।

সুতে সুতে ন্যোকসে বৃহদ্‌বৃহত এদরিঃ।
ইন্দ্রায় শূষমর্চ্চতি ॥ ১০ ॥

অরিঃ আ ইৎ (আর্য্য যোদ্ধা বা কর্ম্মী—'আ ইৎ' পাদপূরণে) সুতে সুতে (প্রতি সোমার্পণে) ন্যোকসে (নি+ওকসে, অন্তর নিবাসী) বৃহতঃ (বৃহৎ) ইন্দ্রায় (ইন্দ্রের জন্য) বৃহৎ শূষং (জ্যোতির্ম্ময় শক্তিকে, তেজকে) অর্চ্চতি (ঋক্‌মন্ত্রে অর্থাৎ জ্যোতির মন্ত্রে প্রজ্বলিত করিতেছেন)।

সত্যবাক্যের দ্বারা সত্যকে উচ্চারিত করিতেছে যাহারা সেই আমরাই ডাকিতেছি ইন্দ্রকে। ইন্দ্র হইতেছেন বস্তুরও যে বস্তু তাহার অধিপতি, তিনি দীপ্তমন্ত্রের আধার, তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন স্বস্তিকে লক্ষ্য করিয়া ॥ ৯ ॥

যে বৃহৎ ইন্দ্র প্রতি সোমার্পণে আমাদের অন্তর-বাসী, তাঁহারই উদ্দেশ্যে আর্য্যযোদ্ধা দীপ্তমন্ত্রে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে বৃহৎ এক জ্যোতির্ম্ময় শক্তি ॥ ১০ ॥

দশমং সূক্তম্

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে ॥ ১ ॥

গায়ত্রিণঃ ('গায়ত্র'-মন্ত্র যাহাদের তাহারা—সায়ণের মতে, সামগায়কেরা। 'গায়ত্র' হয়ত যে মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হয়, গন্তব্যে পৌঁছান যায়) ত্বা গায়ন্তি, অর্কিণঃ (ঋক্‌মন্ত্র যাহাদের তাহারা—'ঋক্' যে মন্ত্রে হয় জ্ঞানের জ্যোতির প্রকাশ) অর্কং (জ্যোতিকে অথবা জ্যোতির্ম্ময় তোমাকে) অর্চ্চন্তি (মন্ত্রে জ্যোতিষ্মান করিতেছে), শতক্রতো (হে শতক্রতু !) ব্রহ্মাণঃ (ব্রহ্ম-মন্ত্র যাহাদের তাহারা) ত্বা বংশং ইব (বাঁশের অর্থাৎ মইএর মত—'বংশ' এর যে প্রকৃতিগত অর্থ 'আনন্দের আশ্রয়' সেদিকেও ইঙ্গিত করা হইতেছে) উৎ যেমিরে (উঠিয়া চলিয়াছে,—'যম' ধাতু = যত্ন করা, শ্রম করা)।

যৎ সানোঃ সানুমারুহদ্ভূর্য্যস্পষ্ট কর্ত্ত্বং।
তদিন্দ্রো অর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি ॥ ২ ॥

যৎ (যখন, যতই) [যজমান বা সাধক] সানোঃ (সানু হইতে, নিম্নতর ক্ষেত্র বা স্তর হইতে) সানুং (সানুতে, উচ্চতর ক্ষেত্র বা স্তরে) আরুহৎ (আরোহণ করিয়াছে), [আর] ভূরি (প্রভূত, বহুল) কর্ত্ত্বং (করণীয় কর্ম্ম) অস্পষ্ট (প্রকট হইয়াছে—স্পশ্ = স্পষ্ট দেখা), তৎ (তখন, ততই) ইন্দ্রঃ অর্থং (ক্রমগতি, প্রগমন সম্বন্ধে) চেততি (সচেতন হইয়াছে)—বৃষ্ণিঃ (বীর্য্যবান বৃষ, পুরুষ অর্থাৎ ইন্দ্র) যূথেন (গোযূথ লইয়া) এজতি (সবেগে চলিয়াছেন)।

দশম সূক্ত

তোমারই উদ্দেশ্যে গাহিতেছে গায়ত্র-মন্ত্র যাহাদের, তোমারই দীপ্তি প্রদীপ্ত করিতেছে দীপ্ত-মন্ত্র যাহাদের। হে শতধা কর্ম্মশক্তি! অন্তর-পুরুষের বাণী পাইয়াছে যাহারা, তাহারাও আনন্দস্তম্ভের মত তোমাকেই বাহিয়া উঠিয়া চলিয়াছে॥ ১॥

ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর ক্ষেত্রে মানুষ যতই আরোহণ করিতেছে ততই সম্মুখে প্রকট হইতেছে আরও বহুতর করণীয় কর্ম্ম—ইন্দ্রও ততই তাঁহার গন্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতেছেন, ততই এই বৃষরাজ তাঁহার আলোকযূথ লইয়া ছুটিয়া চলিতেছেন॥ ২॥

যুক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা ।
অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর ॥ ৩ ॥

কক্ষ্যপ্রা ('কক্ষ্য' অর্থাৎ পেটি, পরিপূর্ণ করিয়া, জুড়িয়া আছে যাহারা, অর্থাৎ পুষ্টকলেবর, শক্তিমান) বৃষণা (সমর্থ পুরুষ যাহারা) কেশিনা (কেশরযুক্ত) হরী (জ্যোতির্ময় অশ্বযুগলকে) যুক্ষ্বা হি (সংযুক্ত কর—রথে) ; অথা (তৎপর) [হে] সোমপা ইন্দ্র ! নঃ গিরাং (আমাদের সত্যবাণী সকলের) উপশ্রুতিং (অন্তরঙ্গ শ্রোতারূপে) চর (হইয়া চল) ।

এহি স্তোমাঁ অভি স্বরাভি গৃণীহ্যা রুব ।
ব্রহ্ম চ নো বসো সচেন্দ্র যজ্ঞং চ বর্দ্ধয় ॥ ৪ ॥

স্তোমান্ আ (স্তোম সকলের নিকট) এহি (এস), [তাহাদের] অভি স্বর (প্রত্যুত্তর দাও) অভি গৃণীহি (ব্যক্ত কর) আরুব (উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কর) ; বসো ! (হে সত্যবস্তু, সারসত্তা) ইন্দ্র ! নঃ ব্রহ্ম চ, যজ্ঞং চ সচা (যুগপৎ) বর্দ্ধয় ।

উক্থমিন্দ্রায় শংস্যং বর্ধনং পুরুনিষ্ষিধে ।
শক্রো যথা সুতেষু নো রারণৎ সখ্যেষু চ ॥ ৫ ॥

পুরু নিষ্ষিধে (বহু নিষ্পাদন করেন যিনি, বহুল কর্ম্মা, নিঃ+সিধ্) ইন্দ্রায় বর্দ্ধনং (বর্দ্ধমান) উক্থং শংস্যং (প্রকটতব্য, প্রকাশনীয়), যথা (যেন, যাহাতে) শক্রঃ (শক্তিমান অর্থাৎ ইন্দ্র) নঃ সুতেষু সখ্যেষু চ রারণৎ (আনন্দ গ্রহণ করিতে পারেন—রণ্) ।

সমর্থ পুরুষ যাহারা, পূর্ণ যাহাদের কলেবর, সেই কেশর-ভূষিত জ্যোতির্ম্ময় অশ্ব দুটি তোমার রথে সংযুক্ত কর। হে ইন্দ্র! হে রসপায়ী! আমাদের সত্যবাণীর হও তুমি শ্রুতিধর ॥ ৩ ॥

এস এখানে আমাদের প্রতিষ্ঠা-মন্ত্রে, দাও তাহাদের প্রত্যুত্তর, তাহাদিগকে ব্যক্ত কর, উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কর। সত্যবস্তু তুমি, হে ইন্দ্র! আমাদের অন্তরপুরুষের বাণীকে, আমাদের যজ্ঞীয় কর্ম্মকে যুগপৎ উপচিত কর ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রের জন্য, সেই বহুকর্ম্মীর জন্য প্রকাশ করিতে হইবে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান যে সত্যবাক্; তবেই সেই শক্তিমান আমাদের রসসৃজনে, আমাদের সখ্যে আনন্দ গ্রহণ করিবেন ॥ ৫ ॥

তমিৎ সখিত্ব ঈমহে তং রায়ে তং সুবীর্য্যে।
স শক্র উত নঃ শকদিন্দ্রো বসু দয়মানঃ ॥ ৬ ॥

তং ইৎ (তাঁহাকেই) সখিত্বে, তং রায়ে, তং সুবীর্য্যে ঈমহে। উত (আর) সঃ শক্রঃ ইন্দ্রঃ নঃ বসু (আমাদের সত্যসত্তাকে) দয়মানঃ (দান করিয়া চলেন যিনি—তেমন) শকৎ (যেন হইতে পারেন, হইতে যেন সমর্থ হন)।

সুবিবৃতং সুনিরজমিন্দ্র ত্বাদাতমিদ্‌যশঃ।
গবামপ ব্রজং বৃধি কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্র! ত্বাদাতং (তোমার দত্ত বা তোমার গৃহীত, অধিগত) যশঃ (জয়শ্রী) ইৎ (নিশ্চয়) সুবিবৃতং (সুবিস্তৃত, সর্ব্বব্যাপী) [এবং] সুনিরজং (দোষলেশহীন, নিষ্কলঙ্ক, সুবিমল)। অদ্রিবঃ (হে অদ্রিবান্ অর্থাৎ বজ্রশালী!), গবাং (গোরাজীর) ব্রজং (নিবাসস্থান, 'খোঁয়াড়') অপবৃধি (উন্মুক্ত কর, খুলিয়া ধর) রাধঃ (আনন্দকে) কৃণুষ্ব (সৃষ্টি কর, গড়িয়া তোল)।

নহি ত্বা রোদসী উভে ঋঘায়মানমিন্বতঃ।
জেষঃ স্বর্বতীরপঃ সং গা অস্মভ্যং ধূনুহি ॥ ৮ ॥

রোদসী (স্বর্গমর্ত্ত্য) উভে (উভয়ে) ঋঘায়মানং (ঋজুগতিশালী, গন্তব্য অভিমুখে ধাবমান) ত্বা ন ইন্বতি (ঘিরিয়া রাখিতে, ধরিতে পারে না। ইন্=rush upon—pervade)। স্বর্ব্বতীঃ (স্বর্-যুক্ত, স্বর্লোকের, জ্যোতির্ম্ময়) অপঃ (জলধারা) জেষঃ (তুমি—অধিকার কর, জয় কর), অস্মভ্যং (আমাদের দিকে) গাঃ (গোরাজী) সং ধূনুহি (ছুটাইয়া চালাইয়া দাও)।

তাঁহাকেই সখারূপে আমরা চাহিতেছি, পূর্ণ আনন্দের জন্য তাঁহাকেই, অমোঘ বীর্য্যের জন্যও তাঁহাকেই চাহি। শক্তি-স্বরূপ সেই ইন্দ্রই আমাদের সারবস্তু দানে সমর্থ॥ ৬॥

হে ইন্দ্র! উদারপ্রসারিত, নিষ্কলঙ্ক তোমার দান যে বিজয়শ্রী। হে বজ্রধারী! আলোকযূথের আবাস উন্মুক্ত করিয়া ধর, আনন্দ-ধন কর সৃষ্টি॥ ৭॥

ঋজুগতিভরে তুমি যখন ছুটিয়া চল, তখন স্বর্গমর্ত্ত্যে মিলিয়াও তোমাকে ঘিরিয়া রাখিতে পারে না। জ্যোতির্ম্ময় জলরাশী তবে কর অধিকার, আলোকযূথকে আমাদের অভিমুখে ছুটাইয়া দাও॥ ৮॥

আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূ চিদ্দধিষ্ব মে গিরঃ।
ইন্দ্র স্তোমমিমং মম কৃষ্বা যুজশ্চিদন্তরং ॥ ৯ ॥

আশ্রুৎ কর্ণ (কর্ণ যাহার শ্রবণের জন্য সর্ব্বদা উদ্যত, পূর্ণ যাহার দিব্য-শ্রবণ) হবং (আহ্বান) শ্রুধী নু (শোন তবে) মে গিরঃ চিৎ দধিষ্ব (ধারণ কর, গ্রহণ কর) ইন্দ্র ! মম ইমং স্তোমং, যুজঃ চিৎ (তোমার সাথীরই অর্থাৎ আমার) অন্তরং (অন্তরে) কৃষ্ব (সৃষ্টি কর)।

বিদ্মা হি ত্বা বৃষন্তমং বাজেষু হবনশ্রুতং।
বৃষন্তমস্য হূমহ ঊতিং সহস্রসাতমাং ॥ ১০ ॥

বাজেষু (সকল ঋদ্ধিতে) বৃষন্তমং (প্রচুর সামর্থ্যশালী,—সকল যাঁহার মধ্যে প্রচুরভাবে রহিয়াছে অথবা যিনি দিতেছেন প্রচুরভাবে) হবনশ্রুতং (আহ্বান শুনিতেছেন যিনি সেই) ত্বা বিদ্মহি। বৃষন্তমস্য (অর্থাৎ ইন্দ্রের) সহস্রসাতমাং (সহস্রকে অর্থাৎ সহস্রধা ধনকে সম্পূর্ণ অধিকার করিতেছে যে) ঊতিং (কুশল, স্বস্তি) [তাহাকে] হূমহে (আমরা ডাকিতেছি)।

আ তূ ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পিব।
নব্যমায়ুঃ প্র সূ তির কৃধী সহস্রসামৃষিং ॥ ১১ ॥

কৌশিক (কুশিককুলের বা গোত্রের ইষ্ট) ইন্দ্র ! নঃ (আমাদের নিকটে) আ তু (এস), মন্দসানঃ (আনন্দপ্লুত হইয়া, হৃষ্ট হইয়া) সুতং পিব। নব্যং (নবীন) আয়ুঃ (জীবন) সু (সম্যক) প্র তির (সম্মুখে চালাইয়া লও, পার হইতে পারে লইয়া চল—প্রাকৃত জীবন হইতে দিব্য জীবনে), [আমাদিগকে] সহস্রসাং (সহস্র সিদ্ধিযুক্ত) ঋষিং (ঋষি) কৃধী (কর)।

হে দিব্য শ্রোতা! শোন আমার আহ্বান, ধর এই আমার বাণী। হে ইন্দ্র! সাথী তুমি, অন্তরে তোমার তুলিয়া লও এই আমার প্রতিষ্ঠা-মন্ত্র ॥ ৯ ॥

জানি আমরা তোমাকে, প্রচুর প্রচুর তোমার যত ঋদ্ধি, তোমার শ্রুতি ধরিতেছে আমাদের আহ্বান। প্রচুর ঋদ্ধিমান পুরুষের যে স্বস্তি সহস্রকে অধিকার করিয়া আছে, তাহাকেই আমরা ডাকিতেছি ॥ ১০ ॥

কুশিকদিগের দেবতা, হে ইন্দ্র! এস আমাদের নিকটে, আনন্দে বিভোর হইয়া পান কর—এই দিব্য রসায়ন। নবীন জীবন আমাদের পার হইতে পারান্তরে লইয়া চল, আমাদিগকে সহস্রবান্ ঋষি করিয়া তোল ॥ ১১ ॥

পরি ত্বা গির্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ।
বৃদ্ধায়ুমনু বৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ ॥ ১২ ॥

গির্বণঃ (সত্যবাণীতে যাহার আনন্দ—হে ইন্দ্র !) ইমা গিরঃ বিশ্বতঃ (চারিদিক হইতে) পরি ত্বা (তোমাকে ঘিরিয়া) ভবন্তু (হউক, গড়িয়া উঠুক, স্ফুট হউক), বৃদ্ধয়ঃ (অভিবৃদ্ধি সকল) বৃদ্ধায়ুং (অভিবৃদ্ধ জীবন যাহার সেই—তোমার) অনু (অনুসারে) [ভবন্তু], জুষ্টয়ঃ (ভোগ সকল) জুষ্টাঃ (ভুক্ত, আগে তোমার কর্ত্তৃক ভুক্ত) ভবন্তু।

সত্যবাণীর মধ্যে তোমার আনন্দ, এই সকল সত্যবাণী তবে তোমাকে ঘিরিয়া চারিদিকে ফুটিয়া উঠুক। আমাদের যত অভিবৃদ্ধি, হউক তাহারা তোমার অভিবৃদ্ধ জীবনের অনুযায়ী; আমাদের যত ভোগ, হউক তাহারা তোমারই ভোগ ॥ ১২ ॥

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত পুস্তকাবলী

পূর্ণযোগ বার আনা

ভারতের অতীতযুগে আবিষ্কৃত ভিন্ন ভিন্ন সাধনপন্থা—তাহাদের প্রত্যেকের কতটুকু সার্থকতা কতটুকুই বা ত্রুটি—তাহা বিচার করিয়া এমন এক পূর্ণাঙ্গ সাধনার কথা বলা হইয়াছে, যাহা নিখিল মানবজাতির সমষ্টিগত সাধনার পক্ষে প্রযোজ্য।

"এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা লেখকের বিদ্যাবত্তা, ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতার প্রচুর পরিচয় পাইয়াছি।"—ভারতী

"ভাষা অতি সহজ, সরস, দীপ্তিময়ী ; গ্রন্থকারের আপনার শক্তির উপর আস্থা, লেখার অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে।" —তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

দেবজন্ম বার আনা

জগৎ আজ একটা নূতন যুগের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চারিদিকেই একটা গোলমাল ও বিপ্লবের হাওয়া দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমানের এই বিশৃঙ্খলতা ভেদ করিয়া জগতে যে সামঞ্জস্য আসিতেছে, কয়েকটি প্রবন্ধের ভিতর দিয়া তাহাই দেখান হইয়াছে।

"ইহার কোথাও 'বাঁধি' বুলি নাই, একটি উদ্যমশীল সাধনশীল সবল আত্মার স্বাধীন চিন্তা ও প্রতীক্ষীভূত সত্যের স্বাভাবিক প্রকাশ সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট। প্রবন্ধগুলিতে যেমন চিন্তাশীলতা, শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রাহিতা সুব্যক্ত, তেমনি সাত্ত্বিকতা, দৃষ্টির প্রসারতা (Wide outlook) ও উদারতা সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট।"—সৌরভ

স্বরাজের পথে বার আনা

বর্ত্তমান যুগের বাণী কি—বর্ত্তমানের সমস্যাই বা কি, স্বরাজ কি—কোন্‌পথে মানবজাতি প্রকৃত স্বরাজ পাইবে—যে সমস্ত বিষয় বর্ত্তমানে চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, গ্রন্থকার নানান দিক দিয়া তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

নারীর কথা পাঁচ সিকা

পুরুষ ও নারীকে ভর করিয়াই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। এ পর্য্যন্ত পুরুষ নারীকে কি ভাবে দেখিয়া আসিয়াছে—নারীর অন্তরাত্মার পূর্ণ স্বাধীন বিকাশ হইলে সমাজ কিরূপ লইবে—এই সব কথা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে দু'এর জীবনে যে সমস্যা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে বইখানি কি স্ত্রী কি পুরুষ প্রত্যেকেরই পড়া দরকার।

"পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ বিচার নিয়ে এরূপ সুচিন্তিত প্রবন্ধ সমষ্টি বাংলা ভাষায় আর নেই বল্লে অত্যুক্তি হয় না।......গ্রন্থকার, আমাদের বর্ত্তমান দাম্পত্য-জীবনের আর বিবাহ-বন্ধনের যে নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন তা কারও কারও কাছে অপ্রি[illegible]ও যে যুবক সমাজকে ভাবিয়ে তুলিবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।"—বিজলী

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

সাহিত্যিকা	দেড় টাকা
স্বরাজ গঠনের ধারা	দশ আনা
ভারতের হিন্দু ও মুসলমান	আট আনা
The Coming Race	পাঁচ সিকা